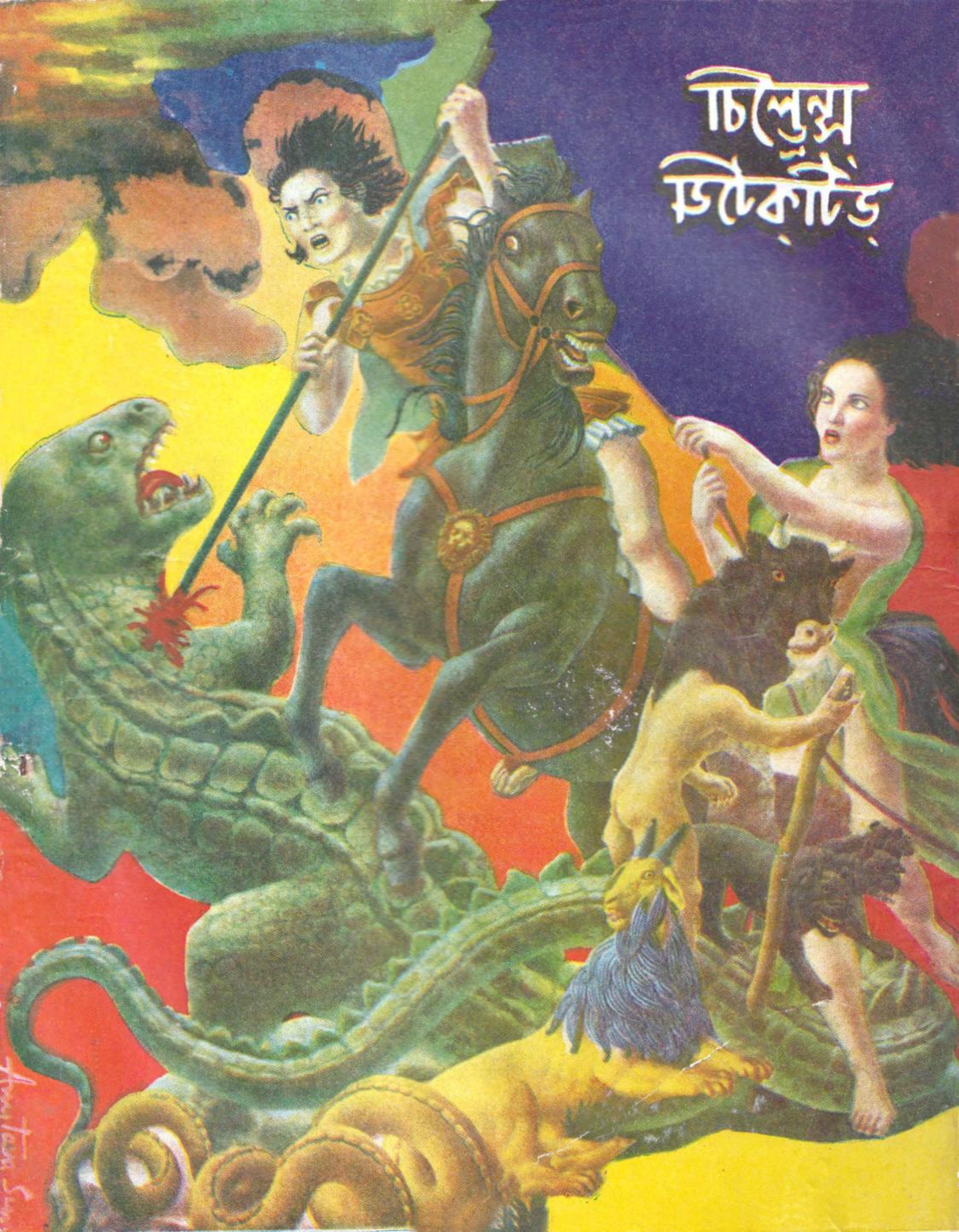
চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু থাকে
এবং আপনি যদি আমাদের সাথে সেগুলি সংরক্ষণে সাহায্য করতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ত্বকের সমস্যা? বোরোলীন ভরসা!

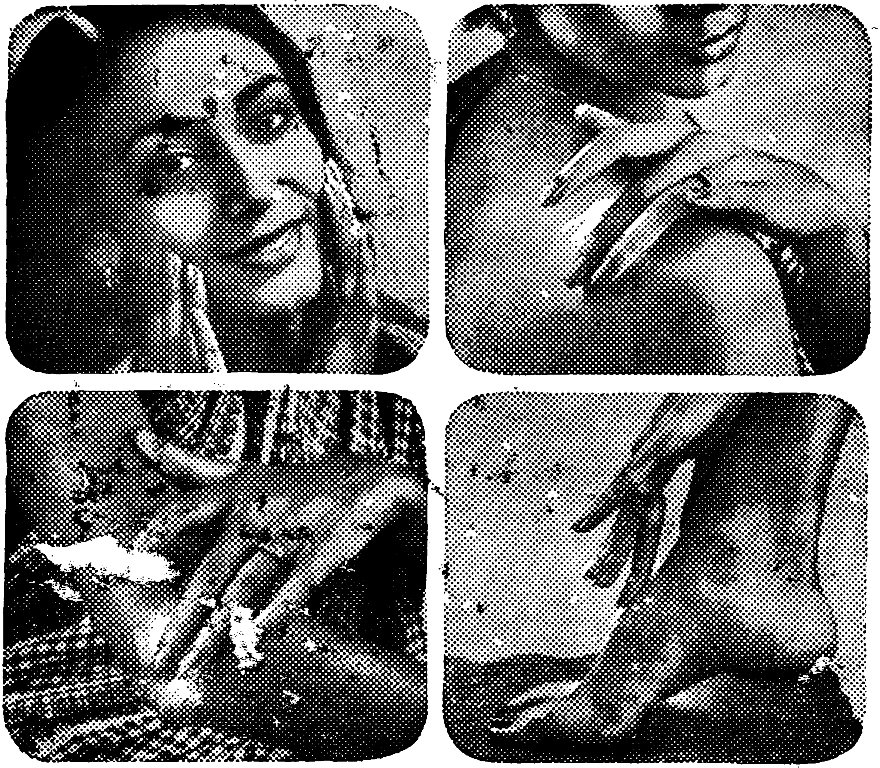

পঞ্চাশ বছর ধরে বোরোলীন সকলের বিশ্বাস রেখে এসেছে। কারণ, আপনার ত্বকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র বোরোলীন। সব ঋতুতে প্রতিদিন মাখুন বোরোলীন। এতে গা-হাত-পা ফাটা ও খসখসে ভাব দূর হয় এবং ত্বক থাকে সুস্থ, সতেজ, কোমল। সাধারণ কাটা-ছড়াতেও অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে বোরোলীন দারুণ কাজ করে।

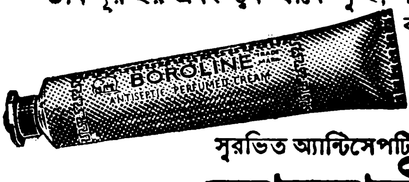

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

কোমল পরিচর্যাকারী ক্রীম

জি ডি ফ[illegible]উটিক্যাল্স লিমিটেড আঙ্গা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

শ্রাবণ। ১৩৮৯ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ৭ই জুলাই, ১৯৮২।

রূপকথা-সংখ্যা

বিজ্ঞান-ভিত্তিক রোমাঞ্চকর কাহিনী

ছোট ভাইবোনেরা,

গতবারের বিজ্ঞান সংখ্যার পর এবারের রূপকথা-সংখ্যা তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। চিরায়ত শিশু-সাহিত্য 'অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড'—তাসের দেশে ছোট্ট মেয়ে অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পড়ে মজা পাবে। আরব্য উপন্যাসের 'একাধিক সহস্র রজনীর' কল্পকথা কিভাবে শুরু হয়েছিল, তার ইঙ্গিত পাবে এই সংখ্যায়। এছাড়া নিয়মিত ফিচারগুলি তো আছেই। পড়তে বসে শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত ছাড়া কোরো না।

পূজা সংখ্যার প্রস্তুতি চলছে। বিশদ বিবরণ পরের সংখ্যায় দেব।

অমিতাভ সেন

প্রধান সম্পাদক

ভিতরের ছাপার সহযোগিতা :
ইম্প্রেসন, কলি-৬, জয়শ্রী প্রেস, কলি-৬
প্রচ্ছদ ছাপা :
নিউ গয়া আর্ট প্রেস, কলি-৯
ব্লক করেছেন : রয়েল হাফ টোন, কলি-৭

সোহিনী প্রকাশনী, ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১
দাম—দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
কিশোরদের পাঠ্য

সূচীপত্র

রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান-ভিত্তিক বড় গল্প
সমরজিৎ কর / সোনা রহস্য ১১
রহস্য উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত / বাদশাহী মোহর ৬
আশ্চর্য কাহিনী
ডঃ সত্যেন দত্ত / কমপিউটার, ২০ ৫৭
রহস্যঘন রোমাঞ্চকর কাহিনী
অমিতাভ সেন / গুপ্তধন রহস্য ৫১
বিস্ময়কর রূপকথা
ডঃ সুপ্তি সেন / তুষার কন্যা ৬১
আরব্য রজনীর অজানা কাহিনী
রুমা চক্রবর্তী / আরব দেশের রাক্ষস ৪৮

বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী রূপকথা
লুই ক্যারল
অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড
ভাষান্তর : মঞ্জিল সেন ২৭

জুলে ভার্ন এর কাহিনী
শিশির কুমার মজুমদার / ফ্রম আর্থ টু মুন ১৯
আরব দেশের গল্প
রাধারমণ রায় / ঘুমন্ত রাজকুমারী ৮
সোহিনী পাল / জানো কি? ১৮
টারজান কমিকস / ফাঁদ (৬) ৬৭
কমিকস সিরিজ / বিষাক্ত ওষুধ রহস্য (৮) ১০
উৎপল ধর / একটি ভয়ংকরের জন্ম ৬৮

অসতর্কতার পরিণাম মৃত্যুও হতে পারে—নিরাপত্তার জন্য পথ চলার নিয়ম মেনে চলুন।

পথচারীরা

কি করবেন—

- পথ চলার সময় ফুটপাত ব্যবহার করুন।
- জেব্রা লাইন, ওভারব্রীজ অথবা সাবওয়ে দিয়েই রাস্তা পারাপার করবেন।

  রাস্তা পার হ'বার আগে প্রথমে ডানদিকে পরে বাঁদিকে তারপর আবার ডানদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সোজাসুজি পার হবেন। রাস্তার মধ্যে আইল্যাণ্ড থাকলে দু'বারে রাস্তা পার হ'বেন যেন দু'টি আলাদা রাস্তা পার হচ্ছেন।
- রাস্তা পার হবার সময় কমপক্ষে ৫০ মিটার দূর থেকে গাড়ীর চালক যেন আপনাকে দেখতে পায়।
- যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সংকেত এবং রাস্তার চিহ্নগুলি ভালভাবে জানুন। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দ্দেশ মেনে চলুন।

কি করবেন না—

- দৌড়ে রাস্তা পার হবেন না।
- দাঁড়ানো গাড়ীগুলির পিছন অথবা মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার হবেন না।
- দু'জনের বেশী দল বেঁধে রাস্তায় হাঁটবেন না।
- চলন্ত যানবাহনের ভীড়ের মধ্যে রাস্তা পার হ'বার চেষ্টা করবেন না। বিরতি পেলে তবেই পার হবেন।
- জেব্রা লাইনের উপরে মন্থর গতিতে চলাফেরা করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ৫২১৩ আই. সি. এ।

[আগের কথা : বিপ্লবদের পুরোন বাড়িতে কোথায় নাকি সোনার মোহর লুকোন আছে। বিপ্লব ও তার মা রত্না দেবী বাড়ি বেচবেন না। বিপ্লবকে কিডন্যাপ করে বেলগেছিয়ার এক বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে কারা আবার বিপ্লবকে সরিয়ে নিয়ে গেল, চোরের ওপর বাটপাড়ি। জ্ঞান হতে বিপ্লব দেখে একটা ঘরে সে চেয়ারে বসে আছে—তার পায়ে শিকল। একজন মহিলার সঙ্গে তার কথা হচ্ছে। শয়তান পরাশরের পরামর্শে মহিলার স্বামী বিপ্লবকে আটকে রেখেছে। শেকলের তালার চাবি মহিলার স্বামীর কাছে।

বাদশাহী মোহর

—তুমি সে কথা কার কাছে শুনলে।

—আমি একদিন নীচের ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি এক সন্নাসী—

—সন্ন্যাসী !

—হ্যাঁ, এক সন্ন্যাসী এসে আমাকে প্রথম কথাটা বলে। কিন্তু তারও আগে একদিন আমার মা কথাটা আমাকে বলেছিল। তাই সন্ন্যাসীর কথায় আমি তাকে শুধিয়ে ছিলাম, কোথায় আছে সেই বাদশাহী সোনার মোহর—

—সন্ন্যাসী কি বললে ?

—সে বললে না—কেবল বলেছিল, দেখ খুঁজে। সন্ন্যাসী এসেছিল আমাদের বাড়িতে আমার বাবা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সোমেশ্বর রায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, বোধকরি মাসখানেক পরে।

—সন্ন্যাসী বললো না ?

—না, আমরা অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই বললে না। চলে গেল, আর তার দেখা পাইনি।

—তারপর।

—তারপরই শুরু হলো এক আশ্চর্য ব্যাপার। রাধাশ্যাম দত্ত নামে এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের পুরানো আমলের ঐ ভাঙ্গা বাড়িটা কিনতে, তিনি নাকি সেখানে বাড়িটা ভেঙ্গে সেই জায়গায় একটা মালটি স্টোরিড বিলডিং তৈরি করবেন। অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল ঘনশ্যাম দত্ত কিন্তু মা রাজী হলো না, তারপরই আর এক ঘটনা ঘটলো।

কেউ তোমাদের চিঠি দিল বাড়িটা সত্তর হাজার টাকা—তাইনা

—আশ্চর্য। আপনি জানলেন কি করে ?

—জানি কারণ সে চিঠিটার মুশাবিদা হয় আমাদেরই বরাহনগরের বাড়ির মধ্যে বসে পরাশরের নির্দেশ মত।

—কিন্তু চিঠিটাত লিখেছিল কোন বাঙালী নয় কে এক রাম কিংকর শেঠ।

—তা অবিশ্যি জানি না, তবে চিঠিটা লেখা হয়েছিল পরাশরেরই পরামর্শ মত আমাদেরই ঘরের মধ্যে বসে।

—আপনার স্বামী তাঁর নাম কি।

—বীরেশ্বর রায়।

—বীরেশ্বর রায় ? তিনি কি এই বাড়িতেই থাকেন।

—থাকতো এখন থাকে অন্যত্র।

—কোথায় ?

পরাশরের শ্যামবাজারে একটা গলির মধ্যে তিনতলা বাড়িতে একটা ফ্ল্যাট আছে সেই ফ্ল্যাটে—

—আপনি বুঝি এখানেই থাকেন।

—কোথায় আর যাবো বাবা—জান বাবা আমার স্বামী বীরেশ্বর রায় লোকটা খারাপ ছিল না। এক মুদির দোকানে খাতা লেখার কাজ করতো। আমাদেরও ছেলে পিলে নেই, যা রোজগার করতো চলে যেতো আমাদের—দু'জনের সংসার—তবে মনে মনে তার বড় লোক হওয়ার একটা গোপন বাসনা ছিল। মধ্যে মধ্যে বলতো ও সে কথা। তারপর কি কুক্ষণে যে পরাশরের সঙ্গে ওর আলাপ হলো। পরাশর হঠাৎ একদিন এসে বললো সে আমার স্বামীর পৈতৃক বাড়িটা কিনতে চায়—

—তার মানে। আপনার কথাটাত ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে কি বীরেশ্বর রায় আমাদের রায় বংশেরই কেউ—

—ঠিকই অনুমান করেছো বাবা। রাজেশ্বর রায়ের দুই বিয়ে, মানে দু'জন স্ত্রী ছিল—

—দুই স্ত্রী—

—হ্যাঁ প্রথম স্ত্রীর সন্তান রাজেশ্বর রায় তোমার ঠাকুর্দ্দা আর রত্নেশ্বর রায় দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান—

ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন, রাজেশ্বর রায় বৈমাত্রেয় ভাই রত্নেশ্বর রায়ের চাইতে বয়েসে দুই বছরের ছোট ছিলেন, প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তান না হওয়ায় রাজেশ্বর আবার বিবাহ করেছিলেন কিন্তু—

—কি।

—সে বিবাহের কথা অনেক দিন কেউ জানত না, আর সে স্ত্রী বাঙালীও ছিল না, ছিল বেহারী। ধানবাদে রাজেশ্বর কয়লার খনি একটা কিনেছিলেন, মধ্যে মধ্যে সেখানে খনির ব্যাপারে যেতেন। সেখানেই কয়লা খনির ম্যানেজার যমুনা প্রসাদের মেয়ে ফুল্লরাকে দেখে তার খুব ভাল লাগে।

পরে ফুল্লরাকে তিনি বিবাহ করেন—কিন্তু কথাটা তার প্রথমা স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী জানতে পারেনি অনেক দিন পর্যন্ত, এমন কি রাজেশ্বরের মৃত্যুর পরও অনেক দিন জানা যায় নি কথাটা। জানা গেল তার মৃত্যুর দেড় বৎসর পরে—

—কি করে জানা গেল।

—ফুল্লরা তার আঠার বৎসরের ছেলে রত্নেশ্বরের হাত ধরে গিয়ে কলকাতার বাড়িতে হাজির হলেন রাজেশ্বরের বিবাহিতা স্ত্রী পরিচয়ে। কিন্তু—

—কি

—প্রথমা স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবী ফুল্লরাকে কোন স্বীকৃতি দিলেন না।

—স্বীকৃতি দিলেন না ?

—না, বললেন সব মিথ্যা কথা। সব বানানো গল্প। রাজেশ্বর দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে তিনি নিশ্চয়ই জানতে পারতেন। ফুল্লরা তথাপি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিন্দুবাসিনী প্রচণ্ড এক রোখা ছিলেন তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না। রত্নেশ্বর তখন তার মাকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে আসেন—

—তাহলে সেই রত্নেশ্বরের—

—হাঁ তারই ছেলে হোল ঐ বীরেশ্বর আমার স্বামী।

—আপনি তাহলে—

—সম্পর্কে তোমার কাকী হই বাবা, কিন্তু তোমাকে কি করে মুক্ত করবো তাই ভাবছি। পরাশরকে বিশ্বাস নেই। সে পারে না অর্থের জন্য এমন কাজ নেই—হয়ত তোমাকে খুনও করতে পারে কলকাতার ঐ বাড়িটা না পেলে। ঐ বাড়ির জন্য পরাশর অগ্রিম দশ হাজার টাকা আমার স্বামীকে দিয়েছে।

ওদের কথার মধ্যে বাধা পড়লো।

দু'জন লোক এসে ঘরে ঢুকল হঠাৎ, জুতোর মচ মচ শব্দ করে।

একজনের পরিধানে জামা সুট অন্য জনের পরনে শেরওয়ানী ও কুর্তা।

—তুমি, তুমি এখানে কি করে এলে ! সুট পরিহিত লোকটি কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলে ভদ্রমহিলাকে। এঘরের তালার চাবি তুমি কোথায় পেলে—যাও বলছি এঘর থেকে।

—যাবো আগে ঐ ছেলেটাকে ছেড়ে দাও—

—না ?

—ছেড়ে দিতেই হবে তোমাকে।

—না, না—চিৎকার করে ওঠেন সুট পরিহিত লোকটা—

—তবে তুমিও জেনে রাখ এঘর থেকে আমি যাবনা—

—তোকে আমি খুন করবো, চিৎকার করে ওঠে লোকটা।

—কর—কর তাই করো—

—সাধ্বী, এখনো বলছি এঘর ছেড়ে, তুমি চলে যাও

—লোকটা আবার বললে।

ঐ সময় দ্বিতীয় লোকটি বলল, বীরেশ্বর থাম, কি করছো—

—না, না ওকে আমি খুন করবো বীরেশ্বর আবার চিৎকার করে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

Gram : GALVOPIPE   Phones : 34-4900, 34-9085

KWALITY STEEL INDUSIRIES

REGD. WITH S.S.I. N.S.I.C. & P. & T.
(GOVT OF INDIA)

Manufacturers of :

Tubular Steel Structures Tubular Poles,
G. I. Tapered Tubes, Oil Tanks as per
IOL Spec & Chimney.

Works :

20, Gadadhor Bhatt Road
P.O. Bhattanagar, Lillooah, Howrah

Office :

134/1, Mahatma Gandhi Road Calcutta-700007

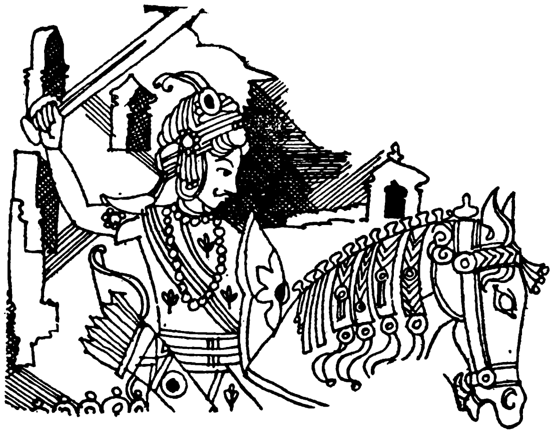

ঘুমন্ত রাজকুমারী

রাধারমণ রায়

উত্তর দেশের রাজা প্রবীণ কুমার নিহত হলেন বিদ্রোহী সহোদর নবীন কুমারের হাতে। রাণী বন্দনা দেবী বন্দী হলেন বিদ্রোহীদের হাতে। যুবরাজ একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর সাহায্যে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে এলেন রাজপুরী থেকে। পালানোর সময় সঙ্গে নিলেন তাঁর দুই প্রিয় সাথী বাঁশি আর তরবারি।

তিনদিন তিনরাত্তির অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সুবীরকুমার। তাঁর ঘোড়াটিও আর ছুটতে চাইছে না। একটি নদীর ধারে এসে তিনি ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজে কিছু ফলমূল আর নদীর ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটি বটগাছের তলায় বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন। তারপরই ঘুমিয়ে পড়লেন। সময় তখন বিকেল।

সুবীর কুমারের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন রাত শেষ হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর তরবারি আর স্বর্ণালঙ্কার গুলো কোনো তস্কর রাত্তিরবেলা চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘোড়াটাকেও তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না।.... শুধু তাঁর বাঁশিটা খোয়া যায় নি, এটুকুই সান্ত্বনা। অগত্যা তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন।

এসময় সুবীর কুমার দেখতে পেলেন একজন ধীবর নৌকায় চড়ে নদীতে মাছ ধরছে। ধীবরকে তিনি নৌকাটাকে তীরে আনার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধ মতন ধীবর নৌকো নিয়ে তীরে এলে তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে ধীবরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ধীবর তখন তাঁকে নৌকোয় তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে উপস্থিত হলো। ধীবরের স্ত্রী রাজকুমারকে খুব আদর-যত্ন করলো।

একদিন কথায় কথায় ধীবর রাজকুমারকে বললো, 'দক্ষিণ দেশের রাজা ঘোষণা করেছেন, যে-কেউ তাঁর ঘুমন্ত মেয়ের ঘুম ভাঙাতে পারবে, তারই সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজত্বও তাঁকে দেবেন। তবে একটা শর্ত আছে, ঘুম যদি

সে ভাঙাতে না পারে, তবে তাহলে তার গর্দান যাবে।

দুঃখের বিষয় বহু দেশের বহু রাজ কুমার বহু চেষ্টা করেছেন রাজকুমারীর ঘুম ভাঙানোর, কিন্তু কেউই পারেন নি। ঘাতকের হাতে তাঁদের সবারই প্রাণ গেছে।

সুবীর কুমার দেখলেন, এটা একটা সুযোগ। তিনি সেইদিনই ধীবরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন দক্ষিণ দেশে। ধীবরের স্ত্রী বেশ কিছু শুকনো খাবার একটা পুঁটলিতে বেঁধে তাঁর হাতে তুলে দিল। পুঁটলিটা ছাড়াও তিনি আরো দুটো জিনিস সঙ্গে নিলেন। একটি তাঁর নিত্য সাথী বাঁশি, অন্যটি একটি ছুরি। ছুরিটি ধীবরের কাছ থেকে তিনি চেয়ে নিলেন আত্মরক্ষার জন্য।

প্রায় মাস দুয়েক পরে সুবীর কুমার উপস্থিত হলেন দক্ষিণদেশে। ধর্মশালায় সে দিনটা বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে তিনি দেখা করলেন দক্ষিণদেশের রাজার সাথে। তারপর রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ঘুমন্ত রাজকুমারীর শয়ন-কক্ষে। তাঁকে মাত্তর একপ্রহর সময় দেওয়া হলো 'রাজকুমারী'র ঘুম ভাঙানোর জন্য।

প্রথমে সুবীর কুমার কথাবার্তার দ্বারা রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনোই ফল হলো না। তখন তিনি শুরু করলেন বাঁশি বাজাতে। বড়ো অপূর্ব সেই বাঁশির সুর! রাজপুরীর অনেকের কানেই সেই সুর গিয়ে পৌঁছোলো। তারা তখন সব কাজ ফেলে রেখে সেই সুরের আকর্ষণে রাজকুমারীর শয়নকক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু যার জন্য এই সুরের সৃষ্টি, সেই রাজকুমারীর কিন্তু ঘুম ভাঙলো না। তিনি শুধু পাশ ফিরে শুলেন, চোখ মেলেন না।

দেখতে দেখতে এক প্রহর সময় প্রায় ফুরিয়ে এলো। সুবীরকুমার দেখলেন ভীষণ বিপদ। রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাতে না পারলে মুণ্ডু কাটা যাবে। তখন তিনি মরিয়া হয়ে পোশাকের ভেতর থেকে বের করলেন ছোরা। সেটা ডানহাতে ধরে রাজকুমারীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'শোন রাজকুমারী, তোমার জন্য অনেকের জীবন গেছে। আমারও যাবে। তবে আমার পরে যাতে আর কাউকে তোমার জন্য না মরতে হয়, তার ব্যবস্থাটা আমি করে যাব। তোমার বুকে এই ছোরাটা বিঁধিয়ে দেব। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনবো, এরই মধ্যে তুমি যদি জেগে না ওঠ, আমি তোমাকে হত্যা করবো।' বলেই তিনি এক-দুই করে গুনতে লাগলেন।

মাত্তর পাঁচ পর্যন্ত গোনা হয়েছে, রাজকুমারী অমনি উঠে বসলেন শয্যার ওপর। যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর রাণীকে গিয়ে খবরটা দিল।

রাজপুরীতে তখন আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করলো। রাজা আর রাণী স্বয়ং এসে সুবীর কুমারকে বরণ করলেন। তারপর একটা শুভদিনে তাঁরা সেই ঘুমন্ত রাজকন্যা, যাঁর নাম ছিল যুথিকা, তার সাথে সুবীরকুমারের বিয়ে দিয়ে দিলেন। যৌতুক হিসাবে দিলেন অর্ধেক রাজত্ব আর অঢেল ধনরত্ন।

সুবীরকুমার এরপর প্রচুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে উপস্থিত হলেন উত্তর দেশে। শত্রুর বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন এবং মায়ের বন্দীদশা মোচন করলেন।

আশ্রয়দাতা ধীবরের কথাও সুবীর কুমার ভুলে যান নি। রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি তাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

সুবীরকুমার পরে জানতে পারেন, কুমারী অবস্থায় যুথিকার নিদ্রা ছিল কপট। জীবন নিয়ে খেলা করতে সে মজা পেত।

বিষাক্ত ওষুধ রহস্য | কমিকস সিরিজ | ৮

[চলবে]

একেই বলে ভাগ্য! নাগাল্যাণ্ডে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে এসে শেঠ হনুমান প্রসাদ শেষ পর্যন্ত কিনা একটি সোনার খনিই পেয়ে গেলেন!

তবে ফ্যাসাদও শুরু হল সেই সঙ্গে।

নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা। সেখান থেকে সরকারী যে রাস্তাটি কিফ্রে পর্যন্ত চলে গেছে, সেই রাস্তারই একটি শাখা-রাস্তা তৈরি করতে গিয়েই ঘটল ঘটনাটা। চারদিকে পাহাড়, শুধু পাহাড়। সেই পাহাড় কেটে তৈরী হচ্ছে পথ। ডিনামাইট চার্জ করে পাহাড় ফাটাতে হচ্ছে। প্রায় দশ কোটি টাকার কনট্রাক্ট।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে তাঁবুর মধ্যে বসে সেই রাস্তার কাজেরই হিসেব নিকেশ করছিলেন শেঠ হনুমান প্রসাদ। হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ার গোবিন্দ মেটা। হনুমান প্রসাদ খুব খুশী, কাজ ভাল ভাবেই চলছে।

এখানকার নাগাদের নিয়ে কোন গোলমাল হয় নি তো, গোবিন্দ? জিজ্ঞেস করলেন হনুমান।

কোন গোলমাল নেই, সার। নাগারা খুবই সাহায্য করছে। আর ক্ষমতা বলতে হবে ওদের। এমন উঁচু উঁচু পাহাড়ে কেমন চটপট ওরা ওঠা নামা করে। ওদের সাহায্য না পেলে আমাদের খুবই অসুবিধে হত। বলেই গোবিন্দ তার পকেট থেকে এক টুকরো পাথর বের করে রাখলেন হনুমানের

সামনে।

পাথরের টুকরোটি দেখে হনুমান অবাক।

না। মোটেই ভুল হয় নি তাঁর। ভূতত্ত্বের ছাত্র। এক সময় আমেরিকায় গিয়ে এ নিয়ে পড়াশুনাও করে এসেছেন প্রচুর। পাথর চিনতে তাই এক সেকেণ্ডও লাগে না তাঁর। কিন্তু নাগাল্যাণ্ডে এ পাথর এল কোত্থেকে ?

কোথায় পেলেন এই পাথর, মিঃ মেটা ? বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

সে এক মজার ব্যাপার, সার। আজ দুপুরে একটি পাহাড় ফাটিয়েছি আমরা। সেখানেই পেয়েছি এই পাথর। বললেন গোবিন্দ—পাথরটি দেখে আমার ভাল লাগল। আপনি তো পাথর সংগ্রহ করেন। তাই ভাবলাম, নিয়ে আসি টুকরোটা। আপনার সংগ্রহশালায় হয়ত এটি স্থান পেতে পারে।

হনুমান ততক্ষণ পকেট থেকে আতস কাচ বের করে আলোর সামনে পাথরটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন।

কালো রঙের ছোট্ট টুকরো।—হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই। কালোর মাঝখানে হলদে চিক্ চিক্ করছে ! না, না, মোটেই ভুল হয় নি তাঁর।

এ যে দেখছি সোনা ! বললেন হনুমান।

কী বলছেন, সার ? পাথরের মধ্যে সোনা ? গোবিন্দ তো অবাক। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর যথেষ্ট। পাহাড়ও ফাটিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু পাহাড় ফাটাতে গিয়ে একেবারে সোনার পাথর উদ্ধার—!

শুনুন, মিঃ মেটা ওখানে পাহাড় ফাটানোর কাজ এখন বন্ধ রাখুন। ওখানকার কাজ এখন বন্ধ থাক। আমি কাল ভোরেই কলকাতা যাচ্ছি এই পাথর নিয়ে। ফিরে আসি, তার পর যা হয় করা যাবে। বললেন শেঠ হনুমান।—দেখবেন ওখানে যেন কোন লোকজন না যায়। আর এ কথাটা আর কাউকে বলবেন না।

রাতের খাওয়া মাথায় উঠল। কোন রকমে সামান্য কিছু মুখে গুঁজে শেঠ হনুমান প্রসাদ গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ডিমাপুরের পথে। ভোরে ডিমাপুর থেকে প্লেনে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় যাত্রা করলেন।

শেঠ হনুমান প্রসাদ ফিরে এলেন ঠিক তিন দিন পরে।

ডিমাপুর বিমান বন্দরে তাঁকে নিতে এসেছিলেন গোবিন্দ মেটা। প্লেন থেকে নামার সময় শেঠকে তাঁর কাছে ভীষণ গম্ভীর বলে মনে হল।

কোন গোলমাল, সার ? গাড়িতে উঠতেই জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে গোবিন্দ।

এর মধ্যে পাহাড়টার ধারে কাছে কেউ যায় নি তো ? বললেন শেঠ হনুমান প্রসাদ।

কেন, বলুন তো ? না। যেমনটি বলেছিলেন, পাহাড়টি পাহারাদার দিয়ে ঘিরে রেখেছি।

পরে বলব। একবার গাড়ির চালকের দিকে চেয়ে কথা বললেন শেঠ। তাঁকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাল।

পথে কোন কথাই বললেন না শেঠ

কোহিমায় তাঁর বাংলোয় ফেরার পর গোবিন্দকে আড়ালে ডেকে বললেন, পাহাড় ফাটানর কাজ এখন বন্ধ রাখুন। লোকদের বলুন রাস্তার অন্য দিকে কাজ করতে। ওই পাহাড়ের গহ্বরে সোনা রয়েছে।

কী বলছেন, সার? শেঠের কথা শুনে গোবিন্দ অবাক। নাগাল্যাণ্ডে সোনা পাওয়া যাবে এতো ভাবাই যায় না। এখনও পর্যন্ত ভারতের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে কোথাও সোনা পাওয়া গেছে, এমন কথা এর আগে শোনেনও নি কখনও।

শুনুন, মিঃ মেটা। আপনি আমার কোম্পানিতে শুধু কাজ করেন, তাই নয়। আপনি আমার পুরনো বন্ধুও। এ খবর কেউ যেন না পায়।

কলকাতা থেকে কেমিস্ট আসছেন। তাঁর সঙ্গে আসছে আরও কয়েকজন লোক। বুঝতেই পারছেন, মাটির নিচে বা পাহাড় পর্বতের সম্পদ সরকার জানতে পারলেই দখল নেবে তাই সব কিছুই আমাদের গোপনে সারতে হবে। যা সোনা পাওয়া যাবে তার কিছু অংশ অবশ্য আপনারাও পাবেন।

এর পাঁচ দিন পরই শুরু হল সোনা সংগ্রহের কাজ। দিনের দিকে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির পাথর সংগ্রহ করা শুরু হল। আর রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে সোনা পাথর থেকে চলতে লাগল সোনা সংগ্রহের কাজ।

তাল তাল সোনা। সারা রাত কাজ চলে। ভোরের দিকে একটি সাদা অ্যামবাসাডারে আসেন শেঠ হনুমান প্রসাদ। বছর ষাটেক বয়েস হলে কি হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি যেন যুবক হয়ে উঠলেন। সারা রাত চলে সোনা সংগ্রহের কাজ। ভোরে সেই সোনা নিয়ে শেঠ চলে যান কোহিমা। কোহিমার একটি ব্যাঙ্কের লকারে লুকিয়ে রাখেন। তা চলছিল ভালই।

কিন্তু মাস তিনেক পর শুরু হল ফ্যাসাদ।

রাতের দিকে সব কাজ দেখাশোনা করেন গোবিন্দ মেটা। সংগৃহীত সোনা নিয়ে রাত তিনটে নাগাদ হাই-ওয়ের পাশে তিনি অপেক্ষা করেন। সেখান থেকে ভোর চারটে নাগাদ সোনার বাট নিয়ে শেঠ চলে যান কোহিমায়।

এই ভাবেই চলছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ভোরে সোনা নিতে এসে চমকে উঠলেন শেঠ হনুমান।

তিনি দেখলেন, কালো রঙের গাড়িটি রাস্তার ধারে ঠিকই দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ গোবিন্দকে তো

দেখা যাচ্ছে না ?

নিজের গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছুটেই গেলেন তিনি গোবিন্দের গাড়ির কাছে।

আশ্চর্য! লোকটা পাগল নাকি ? বেমালুম ঘুমিয়ে পড়েছে ? পেছনের আসনে সোনার বাট রেখে এই ভাবে কেউ ঘুমোয় ? এমন তো কখনও হয় নি ?

হ্যাঁ গাড়ির সামনের আসনে সত্যিই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন গোবিন্দ মেটা। তাই বাইরে থেকে তাঁকে দেখা যায় নি

মিঃ মেটা গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলেন হনুমান প্রসাদ।

কোন সাড়া নেই।

আবার ডাকলেন।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন গোবিন্দ।—

কি সর্বনাশ! এমন দায়িত্বহীনও আপনি হতে পারেন ? রাগের চোটে ফেটেই পড়লেন শেঠ—

জিজ্ঞেস করলেন, মালপত্র সব ঠিক আছে তো ?—

আরে ? আপনার পেছনের আসন তো ফাঁকা ?

গোবিন্দ লাফিয়ে উঠলেন।—সতিই তো ? পেছনের আসনের নিচে যে ছোট্ট দুটি থলে ছিল, কোথায় গেল ?

আর কোথায় গেল। একেবারে হাওয়া।

আজ কত ছিল। প্রশ্ন করলেন শেঠ।

তিন কিলোগ্রাম। কথা বলতে গিয়ে যেন ভিরমি খেলেন গোবিন্দ।

আর ভিরমি। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সোনার থলে হাপুস।

গোবিন্দ বললেন, হঠাৎ কেমন হল গাড়িটা এই গাছ তলায় দাঁড় করানর পর মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। ঝিম ঝিম ভাব। চোখে অন্ধকার দেখলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাই নি।

কি পাগলের মত বকছেন, মিঃ মেটা ? রেগে ফেটে পড়লেন শেঠ।—

আমি মিথ্যে বলি নি, সার। বললেন গোবিন্দ।

এই প্রথম নয়। এই ঘটনা পরের শনিবারও ঘটল,

প্রতি মঙ্গল এবং শনিবার সোনা পাচার করেন গোবিন্দ শনিবার সকালে যথাস্থানে সোনা নিয়ে এসে শেঠ দেখলেন, ওই একই ব্যাপার। গোবিন্দ ঘুমুচ্ছে আর সোনার থলে হাপুস।

প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন শেঠ গোবিন্দকে। দারুণ বিশ্বাসী কর্মী। বন্ধুর মত। তবু সন্দেহ হল তাঁর। সোনাদানার ব্যাপার তো। ভাবলেন এর মধ্যে নিশ্চয় কোন কারসাজি আছে।

শেঠ মুখে কিছু বললেন না। কারণ অনেক গোপন ব্যাপার জানা হয়ে গেছে গোবিন্দর। তাঁকে চটানো ঠিক হবে না।

শেঠ হনুমান প্রসাদ এবার সোনা আনার ভার দিলেন তাঁর আর এক কর্মচারী—রবি দত্তের উপর। রবি দত্তও দারুণ বিশ্বাসী। ঠিক হল পরের মঙ্গলবার সোনার থলে নিয়ে আসবে রবি দত্ত।

কিন্তু সেই একই ঘটনা ঘটল আবার। গাছ তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রবিদত্তের ঘুম। সেই সঙ্গে সোনার থলে হাপুস।

এবার ভড়কে গেলেন শেঠ হনুমান প্রসাদ। বুঝলেন তাঁর গোপন রহস্যটি এবার জানাজানি হয়ে গেছে। কে জানতে পারে? তাঁর যে সব কর্মী সোনার পাহাড়ে কাজ করছেন (সোনা পাওয়ার পর পাহাড়টির নাম সোনার পাহাড় নাম রেখেছেন শেঠ) তাঁদের কাউকেই অবিশ্বাস করা যায় না।

আপাতত চুপ করে রইলেন শেঠ হনুমান প্রসাদ। সরকারের কানে কথাটা উঠলে নির্ঘাৎ জেল। যা কিছু করার চুপচাপ করতে হবে।

কর্মীদের ডেকে তিনি বললেন, সোনা সংগ্রহের কাজ এখন বন্ধ থাক। কলকাতায় যাচ্ছি ফিরে আসি। তারপর যা হয় কিছু করা যাবে।

কলকাতায় এসে পুরো ব্যাপারটা জানালেন তিনি সমীর মিত্রকে। সমীর মিত্র বেসরকারী একটি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান চালান। ব্যক্তিগত ঝুটঝামেলায় পড়ে যারা থানা পুলিস করতে চায় না, তারাই আসে তাঁর কাছে। বছর চল্লিশ বয়েস। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। শেঠ হনুমান প্রসাদকে আগে থেকেই চিনতেন তিনি।

শেঠ বললেন, সর্বনাশ, মিঃ মিত্র। আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও হয় নি!

তিনি পুরো ব্যাপারটাই বলে গেলেন।

তাঁর কথা শুনে গম্ভীর হলেন সমীর বাবু। বললেন কাজটা ভাল করেন নি, শেঠজী! পাহাড়টার কথা আপনার সরকারকে জানান উচিৎ ছিল, কারণ এই সোনা সরকারের সম্পত্তি।

জানি, স্যার। বললেন শেঠ।

একটি শর্তে আপনার কেস্ আমি হাতে নিতে পারি, যদি অপরাধীকে ধরার পর পাহাড়টির কথা আপনি সরকারকে জানান।

তাই করবো। শেঠ বললেন, তিনিও বুঝতে পেরে-ছেন, এ পাহাড় কখনও তিনি গোপন করতে পারবেন না। সরকার একদিন জানবেই। তখন ধনে প্রাণে মরতে হবে তাঁকে।

ধন্যবাদ, শেঠজী! আপনি ভাববেন না, সরকারকে জানানর দায়িত্বটা আমিই নেব।

শেঠ হনুমান প্রসাদের সঙ্গে সমীর মিত্র এলেন নাগাল্যাণ্ডের সেই পাহাড়ে। শেঠ সবাইকে বললেন, ইনি আমার বন্ধু। নাম ডাক্তার তপন রায়। হঠাৎ চলে এলেন আমার সঙ্গে বেড়াতে।

পরদিন থেকেই শুরু হল সমীর মিত্রের কাজ। প্রথমে এখানকার কর্মীদের তিনি আড়াল থেকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ঝানু গোয়েন্দার চোখ। বুঝতে পারলেন, শেঠ এখানে যাঁদের নিয়োগ করেছেন, সত্যিই তাঁরা সৎকর্মী।

ঠিক হল আগের মত আবার সোনা পাচারের কাজ শুরু হবে। একই ভাবে।

গোবিন্দ মেটার উপরই দায়িত্ব রইল। দায়িত্ব দিলেন স্বয়ং শেঠ হনুমান প্রসাদ।

গোবিন্দ বললেন, আবার তো বিপদ হবে সার।

ঠিক আছে, সে আমি বুঝবো।

বললেন শেঠ। বলেই সমীরবাবুকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি কোহিমায়।

পরের শনিবার ভোরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গোবিন্দ। তার আগে সমীর মিত্র ওই গাছের কাছেই মাঝ রাতে গিয়ে একটি ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রইলেন।

হ্যাঁ। গোবিন্দ এলেন, ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। আশ্চর্য। গাড়ি সেই গাছতলায় আসার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গোবিন্দ কেমন করে উঠলেন, দু হাত দিয়ে মাথা টিপতে লাগলেন তিনি। তারপর স্টিয়ারিং ছেড়ে সামনের সিটে শুয়ে পড়লেন।

সমীরবাবু ভাবলেন, একবার গিয়ে দেখবেন ব্যাপারটা কি।

কিন্তু এক পা এগিয়েছেন কি, হঠাৎ কানে ভেসে এল গাড়ির শব্দ। নিজেকে একটি পাথরের আড়ালে আড়াল করলেন তিনি।

সাংঘাতিক ব্যাপার। একটি জীপ। তা থেকে তিন জন মিলিটারি পোশাকের লোক নামল। সবারই হাতে স্টেনগান। তারা গোবিন্দের গাড়ির কাছে এল। গাড়ির পেছন থেকে সোনার থলে নিয়ে চলে গেল।

এর কিছুক্ষণ পর এলেন শেঠ। গোবিন্দকে তিনি জাগিয়ে তুললেন। কোন কথা বললেন না।

সমীর বাবুর কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মতই মনে হল। দেখুন, শেঠজী, মনে হচ্ছে আপনার ওই সোনা পাহাড়ে যারা কাজ করছে, তাদের সবাই বিশ্বাসী নয়। মিঃ মেটা কখন এখানে গাড়ি নিয়ে আসবেন

এবং তাতে যে সোনা পাচার হচ্ছে, এ খবর কেউ না কেউ ভেতর থেকে বাইরে পৌঁছে দিচ্ছে। বললেন তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, গাড়ি নিয়ে গাছ তলায় দাঁড়ানর পর ভোর চারটের সময় অমন ঘুমে আচ্ছন্ন হচ্ছেন কেন গোবিন্দ?

বাংলোয় ফিরে যাওয়ার পথে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন তাঁকে তিনি।—মিঃ মেটা এখানে গাড়ি নিয়ে আসার সময় কিছু কি খেয়েছেন? কোন ওষুধ?

না। ওষুধ খাননি। স্বাস্থ্যও তাঁর খুব ভাল।

গোবিন্দ খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হবেন না? আবার খোয়া গেল সোনার থলে। মন খারাপ হওয়ারই কথা।

আর এই অন্যমনস্কতার দরুন হাতের স্টিয়ারিং বেসামাল হওয়ায় হঠাৎ পথ থেকে ছিটকে গিয়ে

তাঁর গাড়িটি ধাক্কা মারলো একটি পাথরে।

পেছনে ছিলেন শেঠজী। তিনি ব্রেক কষলেন। সামনে গোবিন্দের গাড়ির স্টিয়ারিং-এর মাঝখানে যে প্লাস্টিকের ঢাকনাটি ছিল, সেটি খুলে বেরিয়ে এল। ধাক্কাটা অবশ্য তেমন বেশি হয় নি।

গোবিন্দের পাশে বসে ছিলেন সমীর বাবু। তিনি তাল সামলে নিলেন।

কিন্তু তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিং-এর উপর। তার গর্তের মধ্যে—মানে প্লাস্টিকের ঢাকনা যেখানে ছিল তার নিচে দেখলেন ছোট্ট একটি বাক্স। দেখতে কতকটা লাউডস্পিকারের মত।

এই বাক্সটি কোত্থেকে এল, মিঃ মেটা? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তাইতো। এটা তো আমি দেখিনি।

শেঠজীও দেখলেন বাক্সটি।

এটা একটি ইনফ্রাসাউণ্ড প্রজেকটার। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সমীর বাবু। এ ধরনের যন্ত্র আগেও তিনি দেখেছেন।

শেঠজী, গোবিন্দ বাবুর গাড়ি এখানে থাক। আপনার গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি একবার চলুন তো ওই গাছ তলায়, কুইক! বলেই গোবিন্দবাবুকে নিয়ে সমীরবাবু শেঠজীর গাড়িতে এলেন রাস্তার ধারের সেই গাছ তলায়। বটগাছ।

সমীর বাবু গাছে উঠলেন।

যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই।—এই মগ ডালে আজ সকালেই কেউ বসেছিল। ছাল খসে গিয়ে টাটকা আঠা বেরিয়েছে।

গাছ থেকে নেমেই সমীর বাবু বললেন, এক্ষুনি চলুন আপনার সোনা পাহাড়ে। সেখানে আপনার সবক'টি কর্মীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

মিনিট পনেরর মধ্যেই দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন সবাই।

পৌঁছতেই শেঠজী শুনলেন, গতকাল রাত থেকে মহীন্দর সিংকে পাওয়া যাচ্ছে না। মহীন্দর সিং ছিল তাঁর ইলেকট্রনিকস বিভাগের প্রধান।

সঙ্গে সঙ্গে সমীর বাবু গিয়ে মহীন্দরের ঘরে তল্লাস করলেন। আর যা ভেবেছিলেন, তাই ঘটল। মহীন্দরের ঘরে পাওয়া গেল সেই স্টিয়ারিং-এর মধ্যে পাওয়া মাইক চালানর যন্ত্রের কিছু সাজ সরঞ্জাম।

প্রায় ঘণ্টা খানিক পর মহীন্দর এল। বলল, ভোরে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল সে।

তার কথায় মৃদু হাসলেন সমীর বাবু। বললেন, জানি, মিঃ সিং। আসুন। আপনার সঙ্গে একটু কথা সেরে নিই। শেঠজী, আপনিও আসুন।

মহীন্দর সিং-এর ঘরে গিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট স্পিকারটি বের করে তার সামনে তুলে ধরলেন। স্পিকারটি দেখতেই মহীন্দর একেবারে কাত।—আমার কোন দোষ নেই, সার। ওরা আমাকে বলেছে।—শেঠজীর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেলল মহীন্দর।

ওরা কারা?

বার্মা মুলুকের লোক। সন্ত্রাসবাদী, ওদের মধ্যে বিদ্রোহী নাগারাও আছে। ওরা এখানকার খবর রাখে। বলেছে, ওদের হয়ে কাজ না করলে খুন করবে আমাকে।

তা হলে, বুঝলেন শেঠজী। বললেন সমীর বাবু।—এই স্পিকারটি মহীন্দরই বসিয়েছে গাড়ির স্টিয়ারিং-এর মধ্যে। মহীন্দরের সঙ্গে থাকে যন্ত্রটি চালু করবার সরঞ্জাম। গোবিন্দ বাবু সেই গাছের নিচে যাওয়ার আগে প্রাতঃভ্রমণের নাম করে মহীন্দর তাঁর আগেই বেরিয়ে যায় এবং ওই বটগাছটার মগডালে গিয়ে অপেক্ষা করে। তারপর গোবিন্দ বাবু সেখানে

গিয়ে গাড়ি পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে মহীন্দর চালু করে তার বেতার যন্ত্র। সেই যন্ত্র স্টিয়ারিং-এর মধ্যেকার স্পিকারটি চালু করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরুতে থাকে ইনফ্রা শব্দ, এই শব্দের কম্পাঙ্ক সাধারণ শব্দ, যা আমরা শুনতে পাই, তার চেয়ে অনেক কম। কুড়ি হার্টজ-এর নিচে। এ শব্দ কানে শোনা যায় না। কিন্তু এর প্রভাবে মাথা ধরে গা বমি বমি করে। প্রাবল্য বেশি হলে কেউ অজ্ঞান হতে পারে। মহীন্দর এই শব্দের সাহায্যেই অজ্ঞান করেছে গোবিন্দ মেটাকে। আর সেই অবসরে সন্ত্রাসবাদীরা লুঠ করেছে আপনার সোনা।

শেঠ হনুমান প্রসাদ তাঁর কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

শুনুন, শেঠজী। এবার এই কারবারটি বন্ধ করুন। জানা জানি হলে আপনারই বিপদ। সরকার হাতকড়া পরাবে। কী দরকার ঝুটঝামেলা করে ?

বেশ। তাই হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শেঠ হনুমান প্রসাদ।

মহীন্দর মাথা নীচু করে বসে রইল।

জানো কি ?

নোবেল প্রাইজ কি ?

ডিনামাইটের আবিষ্কারক সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুসারে প্রতি বৎসর (১) রসায়ন শাস্ত্র, (২) পদার্থ-বিদ্যা, (৩) চিকিৎসা শাস্ত্র ও শারীর বিজ্ঞান, (৪) সাহিত্য এবং (৫) বিশ্ব শান্তি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মোট প্রায় ৫,২০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দাতার দাম অনুসারে এই পুরস্কারের নাম হইতেছে "নোবেল প্রাইজ"। একই বিষয়ে এক জনকে দুবার পুরস্কার দেওয়া হয় না।

কর্পূর কি ?

একজাতীয় মূল্যবান গাছের কাঠ হইতে পাওয়া যায় সাদা সুগন্ধি পদার্থ।

মৃগনাভি কি ?

শিংহীন একজাতীয় ছোট হরিণের নাভির ভিতরে একটি থলি থাকে। এই থলিতে সেই মূল্যবান মৃগনাভি থাকে। ইহার সুগন্ধে সকল প্রাণী মাতোয়ারা হইয়া যায়।

স্পঞ্জ কি ?

উদ্ভিদের মত দেখিতে একপ্রকার জলজ প্রাণী। এই প্রাণীর নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার কোন ক্ষমতা থাকে না। এই জীবের দেহাবশেষকে স্পঞ্জ বলে।

সবচেয়ে তরল ধাতুর নাম কি ?

পারদ।

হাদিস কি ?

হজরত মহম্মদের মুখনিঃসৃত মুসলমান ধর্মের সামাজিক নিয়মাবলী।

ফ্রম আর্থ টু মুন

ভাষান্তর : *শিশির কুমার মজুমদার*

গোড়ার কথা :

নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র, শক্তিশালী কামান ইত্যাদি তৈরি করে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র ও সমরনায়কদের সরবরাহ করাই হল 'কামান সঙ্ঘের' কাজ সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কামান সঙ্ঘের কোনও কাজ নেই, সবাই বেকার হয়ে পড়েছেন। সেই সময় সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট মিঃ বারবিকেন প্রস্তাব করলেন, চাঁদকে লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে হবে। আয়রন মাউন্টেনে গর্ত খুঁড়ে কামানের ছাঁচ তৈরী হল, কামান ঢালাই হল। কামানের গোলাটা হল ফাঁপা। তার ভেতরে ঢুকেছেন, প্রেসিডেন্ট মিঃ বারবিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল আর নবাগত ঝুঁকিবাজ আরডেন। নির্দিষ্ট সময়ে কামান দাগা হল। গোলা ছুটে চললো চাঁদের দিকে। একটা উল্কা গোলাটার পাশ দিয়ে চলে গেল। বারবিকেনের প্রিয় কুকুরটা মারা যেতে, মৃতদেহটা বিশেষভাবে তৈরী জানলা দিয়ে মহাশূন্যে ফেলে দেওয়া হল। গোলার ভিতরের তিনজন চমকে ওঠেন। কালো মতন কি একটা গোলার দিকে ছুটে আসছে! ...এটা আর একটা উল্কা ?]

—ওই, ওই ওটা ফিরে এসেছে ফের। চেঁচিয়ে উঠলেন আরডেন। অবাক তিনজনই এবারে দেখতে পেলেন বিশাল ব্যাগের মত জিনিসটার একটা মাথা আছে, আছে চারটে পা। ওটা আর কিছুই না মরা কুকুরের দেহটা!

—এমনই হবে ভেবেছিলাম, বললেন বারবিকেন।

—ওটা পড়ে গেল না পৃথিবীতে ?

—কেন পৃথিবীতে পড়বে কেন? আমরা তো পড়ছি চাঁদের বুকে।

—তাহলে চাঁদেই পড়ে গেল না কেন ? কেন ওটা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ?

—বাঃ, বাইরে যে বাতাসের বাধা নেই, তাই উঁচু থেকে লোহা খণ্ড আর পালক এক সঙ্গে ফেললে দুটোই এখানে এক সঙ্গে পড়বে। কুকুরের দেহটাও সমান গতিতে গোলাটার সঙ্গে চলেছে চাঁদের দিকে। অবশ্য ওটা এখন গোলার টানে গোলার চার পাশে চাঁদের মত ঘুরছে।—এ হল ভাল, আমরা ডন স্টারের কথা শুনছি। এ তো দেখছি ডন মুন।

এতক্ষণে নীচের জানলা দিয়ে ভাল করে দেখলেন বারবিকেন, দেখে উনিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, একি, চাঁদ আমার ডানদিকে কেন, গোলাটার মুখ ঘুরেছে কিন্তু পৃথিবীর দিকে পুরো ঘোরেনি কেন ? অবাক কাণ্ড!

একুশ / পাঁচই ডিসেম্বর

পাঁচ তারিখেই চাঁদ পৃথিবীর সব থেকে কাছে আসবে। সেদিনই গোলাটার চাঁদে নামা উচিত। চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে এসে গিয়েছে। তাই আর পৃথিবীতে ফেরার কথা নেই। চাঁদের কাছাকাছি

এলে রকেট চালিয়ে নামার বেগ কমিয়ে আস্তে নামা যাবে চাঁদে। একটা ভয় আছে যদি কোন কারণে গোলাটা পাশাপাশি পড়ে গড়িয়ে যায় তাহলে ভিতরের যাত্রীদের হাত পা ভাঙ্গতে পারে। গোলাটা ছোড়া হয়েছে চাঁদের সব থেকে বড় সমতল লক্ষ্য করে। যদি একটুও এদিক ওদিক হয়ে থাকে তবে হয়ত এ গোলা গিয়ে পড়বে পাহাড়ী অঞ্চলে, তাহলেই বিপদ ঘটবে।

নীচের জানলা খুলে বারবিকেন দেখলেন চাঁদ তখনও আংশিক ভাবে পাশের দিকেই দেখা যাচ্ছে! কিন্তু কেন? গোলাটার নীচের দিকটা পুরোপুরেরি নীচের দিকেই হওয়া উচিত ছিল! কোথায় তাহলে কে ভুল করলেন হিসাবে। নিজের হিসাব নিয়ে বসলেন বারবিকেন কিছুই ঠিক বুঝতে পারলেন না।

নিকল বললেন ক্ষতি কি আমরা যদি পাশাপাশি পড়ি?

—পাহাড়ের টানে পাশাপাশি পড়ে গড়িয়ে কয়েক'শ ফুট নীচে পড়তে খুব ভাল লাগবে কি? বললেন বারবিকেন, আমি অন্য কথা ভাবছি!

—কি ভাবছেন?

—এখন বলে আপনাদের চিন্তায় ফেলব না মিছিমিছি। আর একটু দেখি।

নটার সময় আবার জানলা খুলে দেখলেন উনি। খুশি হলেন। জানলার নীচে পুরো রূপালী চাঁদ দেখা যাচ্ছে। কি একি, এতো সেই মাঝের সমতল নয়, যা লক্ষ্য করে কামান দাগা হয়েছিল! এতো পাহাড়ী জায়গা!

নিকল বললেন, আমরা তাহলে নামছি, তবে অন্য জায়গায়!

—আমরা সময়ের হিসাবে পিছিয়ে পড়েছি, বললেন বারবিকেন, নতুন হিসাবে তা হলে রাত নটা নাগাদ নামব আমরা। ততক্ষণে পাহাড়গুলো পার হয়ে যেতে পারি।

—তাহলে আমরা মাঝের সমতল পার হয়ে এসেছি, পার হয়ে যাব পাহাড়গুলোও, এমন করে গোটা চাঁদটাও ছাড়িয়ে যেতে পারি? ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আরডেন।

—তাই তো হবে মনে হচ্ছে এখন! বললেন নিকল।

—কিন্তু আমি তো জানি ঠিক সময়ে ঠিক দিকেই কামান দাগা হয়েছিল, বললেন বারবিকেন।

—তাহলে বিস্ফোরকে কোন গোলমাল ছিল। সব বিস্ফোরকের বাক্সগুলো হয়ত সমান শক্তির ছিল না, ফলে যতটা ধাক্কা পাওয়া উচিত ছিল গোলাটা তা পায়নি, পথে হাওয়ার বাধা তাই ওর গতি হয়ত কিছুটা বদলে দিয়েছে যদি মাইলে এক ইঞ্চি সরে গিয়ে থাকে তো তাহলে আমরা লক্ষ্য থেকে প্রায় চার মাইল সরে গিয়েছি।

—কিন্তু চাঁদ তো দু'হাজার মাইল চওড়া। বললেন আরডেন।

—না ও সব কিছু নয়, বললেন বারবিকেন, নটা বেজে গিয়েছে দু'ঘন্টার মধ্যেই আমাদের মাঝের উপত্যকায় নামা উচিত, কিন্তু আমরা তো তার ধারে কাছেই পৌঁছাতে পারিনি। সময়ের থেকে বহু পিছিয়ে আছি। তাছাড়াও গতিপথ থেকে সরে গিয়েছি বেশ কয়েকশ মাইল। কিন্তু কেন, কেন, কেন এমন হল! একটু ভেবে বারবিকেন নিকলকে বললেন, আচ্ছা আপনি তো জানেন জাহাজ যখন কোনও অজানা দেশের তীরের কাছে পৌঁছায় আর সে জাহাজ স্রোতের টানে বেচাল চলে, তখন জাহাজ তীরে ভিড়ছে কি ভিড়ছে না তা কি করে বুঝতে হয়?

—সোজা কথা তীর থেকে জাহাজের দূরত্বের হিসাব নিয়েই বুঝতে হবে।

—আচ্ছা অমন হিসাব করে গতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতে পারেন কি?

—না তা সঠিক জানা যায় না। তবে গতির একটা আভাস পাওয়া যায়।

—তাহলে চাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থা-টাও বার করুন তো?

—আমাকে তাহলে কিছু সময় অন্তর অন্তর দূরত্বের মাপ নিতে হবে। তাতে কিছু সময় লাগবে।

—কতক্ষণ?

—তা ধরুন দেড় ঘণ্টা।

—বেশ তাই করুন। যন্ত্রপাতি বাক্সে আছে বার করে নিন।

আরডেন বললেন, একাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করব মিস্টার নিকল।

সাড়ে দশটায় নিকল বললেন, যতবার হিসাব নিলাম তাতে মনে হচ্ছে আমরা নীচেই নামছি! কিন্তু আমাদের যাত্রাপথ যেন বেঁকে গেছে! আমাকে আরও কিছু সময় দিন ফের নতুন করে দূরত্ব মাপতে।

মাঝরাতে টেবিলের চারপাশে বেশ চিন্তা নিয়েই বসলেন ওঁরা। চাঁদে ওরা নামেননি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন যে এমন হল তা ওঁরা আর ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। ভীষণ চিন্তায় সবাই তাই চুপ।

কিছু পরে বারবিকেন বললেন, আমাদের উপরে এখন দুটো শক্তি কাজ করছে, একটা কামানের ছুঁড়ে দেওয়া শক্তি, যার জন্য এত দূরে আসতে পেরেছি। অন্যটা চাঁদের আকর্ষণ। এখন যদি চাঁদের আকর্ষণ শক্তি বেশী জোরাল হয় তবে বাঁকা পথে আমরা চাঁদে গিয়েই পড়বো। কিন্তু যদি কামানের ছুঁড়ে দেওয়া শক্তিটাই প্রবল হয়, তবে আমরা চাঁদের কাছ বরাবর গিয়েও বাঁকা পথে ফের মহাশূন্যের দিকে চলে যাব। চাঁদ আমাদের ধরে রাখতে পারবে না।

—তাহলে কোথায় যাব আমরা? জিজ্ঞাসা করলেন আরডেন।

—কোথায় তা কেউই বলতে পারবেন না। হয়ত অন্য কোনও গ্রহের টানে তার দিকেই চলে যাব।

—পথে উল্কাও আমাদের আঘাত করতে পারে

—উল্কা! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বারবিকেন, উত্তর পেয়েছি এতক্ষণে! কেন আমরা চাঁদে ঠিক জায়গায় নামতে পারলাম না। আমরা পথে একটা উল্কার সামনে পড়ছিলাম না? ওটাই তার টানে আমাদের গতিপথ বদলে দিয়েছে! এখন দেখা যাক আমরা চাঁদের উঁচু পাহাড় চূড়ায় টক্কর খাই কিনা। নাকি অন্য কোথাও গিয়ে পড়ি। কিছু-ক্ষণেই বোঝা যাবে কি হচ্ছে।

বাইশ / চাঁদের ও পিঠ

গোলার গতিপথ হিসাব করে দেখা গেল ওটা চলেছে চাঁদের অপর পিঠের দিকে বাঁকা পথ ধরে। চাঁদ থেকে মাত্র সাতশ পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব রেখে। রাত একটায় দেখা গেল সে দূরত্ব কমে হয়েছে ছয়শ মাইল। দুটোয় পাঁচশ মাইল। তারপর ওরা চললেন চাঁদের "প্লেন অব রেনস্" উপত্যকার উপর দিয়ে। তার পরেই যাত্রীরা দেখতে পেলেন "প্লাটো" নামের বিরাট গহ্বর। প্রায় পঞ্চাশ মাইল চওড়া তার মুখ! চারদিক উঁচু গোল, কিন্তু খুবই গভীর। তিনটায় গোলাটা চাঁদের এত কাছে পোঁছাল যে, আরডেন বললেন, লাফিয়ে নামলে হয় না?

ঠিক ভোর চারটায় আলো ছেড়ে গোলাটা ঘোর অন্ধকারের রাজত্বে প্রবেশ করল। ব্যাপারটা দিন থেকে রাত হওয়ার মত নয়। এ যেন হঠাৎ আলো

নেভানোর মত ব্যাপার হল। গোলাটা হঠাৎ চাঁদের আলোর দিক ছেড়ে চাঁদকে বেড় দিয়ে তার না-দেখা দিকেই পৌঁছে গেল। অন্ধকারে হারিয়ে গেল চাঁদ। নিকল অন্ধকারে দূরত্ব মাপা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারে আমরা কোথায় চলেছি? কারও কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে নিজেই বললেন, চলেছি মহাশূন্যে বুধ বা মঙ্গল গ্রহের দিকে, নাকি অন্য কোনও দুনিয়া দেখতে, কে জানে!

—ধৈর্য ধরে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই বললেন বারবিকেন, যদি চাঁদের দেখা পাই ফের তবেই বুঝতে পারব চাঁদ ছেড়ে মহাশূন্যে চলে যাচ্ছি নাকি চাঁদের চার পাশেই ঘুরছি।

হঠাৎ আরডেন চেঁচিয়ে উঠলেন, উল্কা, উল্কা, আবার একটা উল্কা। তখনি ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত আবছা আলো ফুটে উঠল। সবাই জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিকল নীচের জানলাটা খুলে ফেললেন। চাঁদ দেখাই ওঁর উদ্দেশ্য। উল্কাটাই যেন একটা চাঁদেরই মত, কিন্তু ওটা জ্বলছে! ওর সাদা আলো এতই উজ্জ্বল যে তাকিয়ে থাকা যায় না। ভীষণ বেগে মহাশূন্যে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ওটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল। ভাঙ্গা অংশগুলো চারদিকে ছিটকে যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে আরও হাজার টুকরো হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য ওই আলোয় চাঁদকে দেখা গেল নীচে। চাঁদ ছেড়ে তাহলে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়নি ওরা।

—দেখুন দেখুন যতক্ষণ পারেন চাঁদকেই দেখুন। চেঁচিয়ে বললেন বারবিকেন, আপনারা এমন কিছু দেখছেন যা কোন মানুষই জীবনে দেখতে পাবেন না। আপনারা দেখছেন চাঁদের অন্য দিক। ওর কথা শেষ হবার আগেই আবার ঘোর অন্ধকারে চাঁদ হারিয়ে গেল।

আরডেন বললেন, আমি তো শহর মাঠ, রাস্তা লোক আর গাছপালা দেখতে পেলাম। আপনারা?

নিকল বললেন, আমি দেখলাম ওই লেকে মানুষরা মাছ ধরছে। মেয়েরা বাগানে ফুল তুলছে।

—আপনি ধোকা দিচ্ছেন! আরডেন বললেন, সত্যি কি দেখলেন বলুন তো।

—দেখলাম চাঁদ তার জায়গাতেই আছে। হেসে বললেন নিকল, ব্যাস, ওটাই যথেষ্ট, আমরা মহাশূন্যে ভেসে যাইনি।

—চাঁদের বুকে সারাক্ষণই উল্কাপাত হচ্ছে। বললেন বারবিকেন, কিন্তু সেগুলো নিভন্ত উল্কা, এটা জ্বলতে জ্বলতে আসছিল, কারণ পথে নিশ্চয়ই ওটার সঙ্গে অন্য উল্কার ঠোকাঠুকি হয়েছিল, জ্বলে উঠে তাই ওটা ফেটে পড়ল।

—তেমন ঠোকাঠুকি তো আমাদের গোলাটার সঙ্গেও হতে পারে? তাহলে?

—আমরা হাজার টুকরো হয়ে যাব।

—গ্যাসও হয়ে যেতে পারি।

তেইশ / চাঁদকে বেড় দিয়ে

ঘড়ির হিসাবে একটা দিন কাটল। বিকালে নিকল জানলার ধার থেকে বললেন, আমি যেন দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছি।

বারবিকেন জানলার ধারে গিয়ে ভাল করে দেখে বললেন, আমাদের চন্দ্র পরিক্রমা শেষ হল বোধ হয়। দূরে ওগুলো চাঁদের পাহড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, এখুনি সূর্যোদয় দেখতে পাব।

—তার মানে আমরা চাঁদের বুকে নামছি না! বললেন নিকল, এমন কি চাঁদ ছেড়ে মহাশূন্যেও

চলে যাচ্ছি না। তাহলে ঘুরছি চাঁদের চারপাশে! —তাই মনে হচ্ছে. তাহলে জীবন ভোর আমরা চাঁদকেই কেন্দ্র করে ঘুরে মরব!

—তা নাও হতে পারে, বললেন বারবিকেন, জানেন তো আমাদের গতিপথে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে চাঁদ আর পৃথিবীর টান গোলাটার উপরে সমান। আমরা হয়ত সেখানেই আটকে থাকব চিরকাল।

আরডেন বললেন, তাহলে আমাদের তো সেই গাধার দশা হবে, গাধাটার একদিকে ছিল খাবার অন্য দিকে জল। বেচারার ভীষণ খিদে তেষ্টা পেয়েছিল। আগে জল খাবে না আগে খাবার খাবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে মারা গেল। অদ্ভুত সুন্দর সূর্যোদয়ের মাঝ দিয়ে ফের চাঁদের আলোর দিকে এসে গেল যাত্রীরা। এদিকের পাহাড় পর্বত, গহ্বর আর উপত্যকা দেখতে দেখতে চললেন। মাঝে মাঝে দূরত্বের মাপ নিচ্ছিলেন নিকল। এক সময়ে বললেন, দূরত্ব বাড়ছে মিস্টার বারবিকেন। আমরা চাঁদ থেকে সরে যাচ্ছি।

ভীষণ আগ্রহে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূরত্ব মাপা আরম্ভ হল। দেখা গেল প্রতিবারেই দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এক সময় নিকল বললেন, গোলাটা যেন আবার পাশের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। নীচ থেকেও চাঁদ সরে যাচ্ছে ক্রমে। দূরত্বও খুব বাড়ছে

—যাক তাহলে যা ভেবেছিলাম তাই ঘটছে, খুশিতে বললেন বারবিকেন, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। আমাদের বোধ হয় বিপদ কাটল। আমরা বোধ হয় আবার পৃথিবীর আকর্ষণের আওতায় এসে গিয়েছি।

চব্বিশ / গ্রহণ

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ আরডেন বললেন, ব্যাপারকি এদিকেও চাঁদের বুকে অন্ধকার নামছে কেন? সূর্যের আলোয় তো চাঁদ ঝলমল করা উচিত।

বারবিকেন দেখে বললেন, তাইতো, এ যেন রাত নামছে চাঁদে। নিকল বললেন, তাকিয়ে থেকে আমাদের চোখ ধেঁধে গেছে তাই অমন মনে হচ্ছে কি?

ক্রমে অন্ধকার বেশী হল। চাঁদের বুকে আলো ছায়ার খেলা শুরু হল। সব চকচকে ভাব মিটে গিয়ে চাঁদের বুকে কেবল মাত্র লাল আর ধূসর রং দেখা যেতে লাগল।

—ব্যাপার কি? ফের জিজ্ঞাসা করলেন আরডেন।

—গ্রহণ লেগেছে একটু ভেবে বললেন বারবিকেন, সূর্য আর চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী এসে গিয়েছে। পৃথিবীর ছায়া পড়ছে চাঁদে, আমরাও আছি ছায়ার দিকে। এমন দৃশ্যও আর দেখতে পাবেন না। দেখে নিন ভাল করে। শেষ বারের মতন।

পঁচিশ / ভয়ঙ্কর অবতরণ

—ওকথা বললেন কেন? নিকল জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি তাহলে মহাশূন্যে খতম হয়ে যাচ্ছি। উল্কা ছুটে আসছে নাকি?

—না তা নয়, বললেন বারবিকেন, আমরা বোধ হয় পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি।

—কিন্তু কেমন করে? অবাক আরডেন জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তো চন্দ্র, পৃথিবী, উল্কা, নানান কিছুর টানা পোড়েনের মধ্যে রয়েছি। কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছি আমরা।

—না তা নয়, বললেন বারবিকেন, আমরা এখন চন্দ্র পৃথিবীর সমান টানের মধ্যে রয়েছি। এখন আমরা যদি কিছুই না করি তবে হয়ত আবার আমরা চাঁদের চারপাশে চক্কর লাগাব। কিন্তু যদি

আমরা রকেটগুলো ছুটাই তাহলে আবার পৃথিবীর দিকে পাড়ি জমাতে পারি।

—বেশ তাই করলাম না হয়। বললেন নিকল, কিন্তু তাহলে পৃথিবীর কাছে পৌঁছে উল্কার মত জ্বলতে জ্বলতে শক্ত জমিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাব।

—হ্যাঁ তেমন হবার সম্ভাবনাও আছে, বললেন বারবিকেন, কিন্তু কেন ভাবব না যে আমরা পড়ব নরম কিছুর উপরে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। জলে পড়ার সম্ভাবনাই তো বেশী।

—জলে ডুবে মরা কি খুব সুখের হবে? বললেন আরডেন।—আমরা যখন পৃথিবীর কাছে পেঁছাব, কেউ না কেউ আমাদের দেখতে পাবে। বললেন আরডেন, তারা আমাদের উদ্ধার করবেন।—হ্যাঁ তারা জলের তল থেকে তিনটে মৃতদেহ টেনে তুলবে। হাসতে চেষ্টা করে বললেন আরডেন।

শান্ত ভাবে বারবিকেন বললেন ঠিক একটায় রকেট ছোটাতে হবে। তার আগে আসুন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

এলার্মের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন আরডেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ওর ঠুকে গেল ছাদে। দেখলেন আবার সব কিছু শূন্যে ভাসছে যেন। তাহলে দুদিকের সমান টানের মাঝে এসে পড়েছেন ওরা। সবাইকে ডেকে তুললেন উনি।

একটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে সবাই ইলেকট্রিক সুইচের সামনে ঠিক হয়ে বসলেন। ঘড়ি দেখে বারবিকেন বললেন, আমি গুণব দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ চার তিন, দুই এক সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার নিকল আপনি রকেট ছুটাবেন।

ঠিক সময়ে রকেট ছুটল। যাত্রীদের পৃথিবীর দিকে ফেরাও আরম্ভ হল।

ছাব্বিশ / ওরা ফিরবেনই

সালেম জাহাজের নাবিকরা প্রশান্ত মহাসাগরে উপকূলের গভীরতা মাপ ছিল। এগারোই ডিসেম্বর কাজ শেষ করে ওরা ফিরবে ভাবছিল। জাহাজটা ছিল উপকূল থেকে প্রায় দু শমাইল দূরে।

খানা টেবিলে বসে ক্যাপ্টেন অন্যদের সঙ্গে চন্দ্র যাত্রার কথাই আলোচনা করছিলেন। ক্যাপ্টেন বললেন, দশ দিন হল ওরা গেছেন, এখন বোধ হয় ওরা চাঁদের চার পাশে চক্কর মারছেন। তাছাড়া আর কি হতে পারে?

—ওরা ফিরবেনই সার, বললেন অফিসার ফিল্ড। যেন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

—ওটা বোকার মত কথা হল! বললেন ক্যাপ্টেন, আমি জানতে চাই শুধু চাঁদ পরিক্রমার সময় ওদের পৃথিবী থেকে দেখা যাবে কি না? নাকি ওরা চাঁদের পাশ দিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যাবেন চিরকালের মত।—

—আমি বলছি সার ওরা ফিরে আসবেনই। ফের বললেন ফিল্ড।

—দেখা যাক। হেসে বললেন ক্যাপ্টেন, এখন আমাদের ফেরার ব্যবস্থাই করা যাক।

বাইরে গিয়ে ফিল্ড চাঁদের দিকে তাকালেন। নিশ্চয়ই ওরা ফিরে আসবেন, মনে মনে ভাবলেন উনি। তখনি কেমন যেন একটা শব্দ শুনতে পেলেন।—ক্রমে সে শব্দে যেন ছেয়ে গেল দিক-বিদিক। ক্যাপ্টেন আর অন্য অফিসাররাও বাইরে বার হয়ে এলেন। হঠাৎ দূর আকাশে দেখা গেল একটা উজ্জ্বল অদ্ভুত জিনিস! ওটা উল্কা নয়। জিনিসটা ক্রমে বড় হতে হতে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের জলে।

ভীষণ খুশিতে ফিল্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, বলেছিলাম সার ওরা ফিরবেন, ওরাই ফিরে এলেন।

জাহাজের রেডিও, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে তখুনি যোগাযোগ করে সব জানিয়ে কি করতে হবে হুকুম চাইল।

ক্যাপ্টেন তখুনি মাপজোখ নিলেন ঠিক কোথায় জিনিসটা জলে পড়েছে তার। বললেন, ওটা টেনে তোলার মত সরঞ্জাম আমাদের নেই, তবুও জাহাজের মুখ ওদিকেই ফেরাও।

সাতাশ / ওরা ফিরলেন

সারা বিশ্বে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল কেউ বললেন জিনিসটা উল্কাই। বোকা জাহাজিরা অন্য কিছু ভেবেছে। অন্যরা নানা আজগুবি গল্প ছড়াতে লাগল। আর একদল বললেন, জানালায় নাকি আরডেনের মুখ দেখা গেছে!

ম্যাস্টন আর ডক্টর বেলফাস্ট এতদিন দূরবীনের পাশেই সময় কাটিয়েছেন। একবার ওরা যাত্রীদের হঠাৎ দেখতে পেয়েছিলেন চাঁদের পাহাড় টাইকোর (Tycho) কাছে। ছোট্ট একটা বিন্দুর মত। তারপর গ্রহণের অন্ধকারে সব হারিয়ে গেছিল।

সেদিন ডক্টর বেলফাস্ট দূরবীনে ছিলেন। ম্যাস্টন ঘুমাচ্ছিলেন। রাত দশটায় টেলিফোন বাজল। ম্যাস্টনকে কেউ চাইছেন। ম্যাস্টন উঠে ফোন ধরলেন, উত্তেজনায় বললেন, কি বলছেন। অ্যাঁ! প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে? জায়গাটা চিহ্ন করা হয়েছে তো?

মিস্টার বেলফাস্ট, ওরা ফিরে এসেছেন।

আঠাশ / উদ্ধার

জাহাজ রেসকিউ সব রকম সরঞ্জাম আর উপযুক্ত লোক নিয়ে হাজির হল নির্দিষ্ট জায়গায়। ম্যাস্টন আর বেলফাস্টও ছিলেন সে জাহাজে। ঠিক হল জলের তলায় যাবার খাঁচা বেথিস্ফিয়ারে চেপে গভীরে ডুবে গোলাটাকে খুঁজে বের করা হবে। বেথিস্কোপ এমন একটা গোলাকার ধাতুর ফাঁপা খাচা যার মধ্যে হাওয়ার ব্যবস্থা করার যন্ত্র আছে। যার জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়

একজন দক্ষ নাবিককে জলের নীচে নামান হল। বেথিস্কোপটা অনেক খুঁজে নীচ থেকে নাবিকটি ফোনে জানালেন তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। সবাই হতাশ হলেন।

চব্বিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত জলের তল আতি পাতি খোঁজা হল কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। রেসকিউ জাহাজের ক্যাপ্টেন শেষ পর্যন্ত ফেরার হুকুম দিলেন। তাঁরা ক্রিশমাসের আগেই ঘরে ফিরতে চান।

পঁচিশে ডিসেম্বর জাহাজের সামনে থেকে এক নাবিকের চিৎকার শোনা গেল, ওই ওদিকে দেখুন, ওদিকে রূপালি কি যেন একটা ভাসছে জলে। ঝাণ্ডা উড়ছে তাতে।

দূরবীনে দেখা গেল ঝাণ্ডা আমেরিকার। রেসকিউ জাহাজ মহা আনন্দে মুখ ফেরাল তার দিকে। দূরবীনে জিনিসটা দেখে ডক্টর বেলফাস্ট বললেন উঃ কি বোকাই না আমরা। আয়তনের তুলনায় ফাপা গোলাটার ওজন যে অনেক কম সে কথাই ভুলে বসে আছি। ওটা ডুববে কেন, ওটা তো ভাসবে। ওই সেটাই ভাসছে আমাদের সামনে।

নৌকো নামান হল। তাতে চড়লেন ম্যাস্টন আর ডক্টর বেলফাস্টও। গোলাটার কাছে পৌঁছাতেই ওপরের ফোকর দিয়ে আরডেনের গলা শোনা গেল উনি প্রাণ খুলে গাইছিলেন। গান থামতেই

ক্যাপ্টেন নিকল আর প্রেসিডেন্ট বারবিকেনের গম্ভীর গলাও শোনা গেল।

রেসকিউ জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিক হেসে বললেন, ওরা বোধ হয় ওখানে বড়দিনের উৎসব করছেন।

উনত্রিশ / কামান সংঘের সভায়

ঘরে আর জায়গা ছিল না। ছুনিয়া যেন হাজির হয়েছে কামান সঙ্ঘের সভায়। যাত্রী তিন জন মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই চারদিকে হুররে শোনা গেল। আনন্দধ্বনি থামতেই মেজর এলফিনস্টোন, সমস্ত ব্যাপারটার হিসাব নিকাশ শোনালেন, সব খরচ মিটিয়ে সোত্তর হাজার ডলার বেঁচেছে। ঠিক হল ও টাকায় টাম্পায় গাছপালা লাগান হবে। বিস্ফোরণের ফলে সেখানে যা ক্ষতি তা মেরামত করা হবে। কামানের বিশাল গর্তটা বন্ধ করে ওখানে একটা মিনারওয়ালা বাড়ি বানান হবে। তাতে থাকবে একটা ঘণ্টা। সে ঘণ্টা যখন বাজবে সবাই মনে করবে যাত্রীদের চাঁদে যাওয়ার কথা।

মহা আনন্দে সভা শেষ হল। কিছুদিনের মধ্যেই টাম্পাকে ঘিরে সব কিছুই করা হল। আজও লোকে সেই ঘণ্টা মিনার দেখতে যায়।

আটত্রিশ / উপসংহার

এ গল্পের কতটা সত্যি একথা সবার মনে হতে পারে। চাঁদে যাওয়া সম্ভব কি? চাঁদ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা কি সত্যি? উত্তর হল:

(১) কামান দেগে গোলা চাঁদে পাঠান যাবে না। পৃথিবীর চারপাশের বাতাসে ঘা লেগে সে গোলা গরম হয়ে গলে যাবে। তবে চাঁদে তো মানুষ গেছে। কি ভাবে গেছে তাও তো জানা।

(২) টেলিস্কোপে নব্বুই ব্যাসের কোন জিনিসই চাঁদের বুকে দেখা যাবে না।

(৩) পৃথিবীর কোনও দ্বিতীয় চাঁদ নেই। ওটা কল্পনা। বাকি যা কিছু এ গল্পে বলা হয়েছে তা সত্যি। আরডেন চরিত্র নাডার নামে এক দুঃসাহসিক ভদ্র-লোকের কথা ভেবেই লেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে জুল ভার্ন বেলুনে চেপে আকাশে উড়েছিলেন, চাঁদে পাড়ি দেন নি।

আয়রন মাউণ্টেনের উপরের যে ঘণ্টাঘরের কথা লেখা হয়েছে তা কিন্তু সত্যিই ওখানে আছে। ওটা অবশ্য বক নামের এক সাংবাদিক বানিয়েছিলেন।

● বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী রূপকথা ●

অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড

লুই ক্যারল/ ভাষান্তর: মঞ্জিল সেন

[লুই ক্যারলের আসল নাম চার্লস লুট্উইজ ডজ্সন (Charles Lutwidge Dodgson)। তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন লেক্চারার। বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র আর অঙ্ক। লাজুক আর শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

১৮৬৫ সালের চৌঠা জুলাই তিনি এবং তাঁর এক সহযোগী অধ্যাপক রবিনসন ডাক্ওয়ার্থ তিনটি ছোট মেয়েকে নিয়ে নৌকো বিহারে বেরিয়ে ছিলেন। মেয়ে তিনটি ডজ্সনকে ধরল গল্প বলার জন্য। ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন ডজ্সন, তাই প্রায়ই তাঁকে গল্প শোনাতে হত তাদের, বেশীর ভাগই পরিচিত প্রিয় গল্প ঘুরে ফিরে বলতেন। এবার কিন্তু তিনি নতুন এক গল্প শুরু করলেন, রূপকথার গল্প, একেবারে নিজের মন গড়া। তিন বোনের মাঝের জন হল অ্যালিস, বয়স এগারো, সেই প্রথম বায়না ধরেছিল গল্পের, তাই তাকে নিয়েই শুরু হল কাহিনী।

অসম্ভব সব ঘটনা, কিন্তু নদীর স্রোতের মত ছন্দোময় গতিতে বলে চললেন ডজ্সন। ডাকওয়ার্থ একবার বললেন, "তুমি কি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছ নাকি হে?" "হ্যাঁ, তাই," জবাব দিলেন ডজ্সন।

নদীর ধারে সবুজ ঘাসের মাঠ, এখানে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছে খরগোশ, সুতরাং খরগোশ এসে গেল গল্পে। একটার পর একটা অসম্ভব অথচ সুন্দর ঘটনা বলে চলেছেন ডজ্সন, সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে।

মেয়েরা বাড়ি ফেরার পর অ্যালিস বলল, "মিঃ

অ্যালিস গর্তর মধ্যে পড়ে গেল

ডজ্‌সন, আপনি যদি আমার জন্য অ্যালিসের গল্পটা লিখে দিতেন তবে কি মজাই না হত!"

"আমি চেষ্টা করব," ডজ্‌সন জবাব দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাকওয়ার্থের পীড়াপীড়িতে তিনি ওটা লিখে ছাপতে দিলেন। বইটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ পড়ে গেল। শুধু ইংরেজি ভাষায় নয়, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হল অ্যালিসের রোমাঞ্চকর ঘটনা। ছোট বড় সবার মন কাড়ল ওই কাহিনী [অ্যালিসেস্‌ অ্যাড্‌ভেঞ্চারস্‌ ইন্‌ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড]। ওই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডজ্‌সন লিখলেন, 'থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস,' অ্যালিসের দ্বিতীয় পর্ব। সেটাও সমান আদৃত হল, লুফে নিল ছেলে-বুড়ো সবাই। দ্বিতীয় বইটা অ্যালিস লিডেলের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন লেখক, ওই মেয়েটির বয়স তখন চোদ্দ।]

১

খরগোশের গর্তে

দিদির কোল ঘেঁসে নদীর ধারে বসেছিল অ্যালিস, দিনটা ছিল গরম, রাজ্যের ঘুম নেমে আসছিল ওর চোখে। ওর দিদি একটা গল্পের বইয়ে ডুবে আছে।

হঠাৎ একটা সাদা খরগোশ ওর খুব কাছ দিয়ে দৌড়ে গেল। এ খরগোশটা কিন্তু অন্যদের মত নয়। ওটা ওর ছোট্ট কোটের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে বলে উঠল, "ওহো! আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল।"

কোট পরা খরগোশ আর তার ঘড়ি দেখে অ্যালিসের খুব অবাক লাগল, ও লাফিয়ে উঠে পড়ি মরি ছুটল ওটার পেছনে। খরগোশটা মাঠের মাঝখানে একটা মস্ত গর্তে সুড়ুৎ করে গেল ঢুকে। অ্যালিসও ওটাকে তাড়া করে নেমে পড়ল সেই গর্তে।

গর্তটা সুড়ঙ্গের মত খানিকটা সোজা গিয়ে হঠাৎ খাদে নেমে গেছে। অ্যালিস সেই খাদে গড়িয়ে পড়ল। ও যেন গভীর একটা কুয়োর ভেতর দিয়ে চলেছে তো চলেইছে।

নিচে, আরও নিচে। তারপর একসময় এক রাশ শুকনো কাঠি আর পাতার ওপর ধপ্‌ করে পড়ল অ্যালিস। আশ্চর্য! ওর গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। ওর সামনে লম্বা সরু একটা গলি, আর সাদা খরগোশটা ওটা দিয়ে ছুটছিল। অ্যালিস পিছু নিল ওর।

খরগোশটাকে তাড়া করে একটা মোড় নিতেই মস্ত একটা ঘরে পৌঁছে গেল অ্যালিস। ওটার নিচু ছাদ থেকে ঝুলছিল সার সার ঝাড় লণ্ঠন।

হলঘরের চারপাশে দরজা, কিন্তু সবগুলিতেই তালা। "আমি এখান থেকে কি করে বেরুবো!" খুব ভয় হল অ্যালিসের।

হঠাৎ একটা নিরেট কাচের তেপায়া টেবিলের ওপর চোখ পড়ল ওর। টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা সোনার চাবি। ওই চাবিটা দিয়ে কিন্তু কোন তালাই খুলতে পারল না অ্যালিস, হয় তালাগুলো বেশী বড় নয় চাবিটা বেশী ছোট।

তারপরই একটা নিচু পর্দা ও দেখতে পেল। ওটার পেছনে ছোট্ট একটা দরজা, পনের ইঞ্চির বেশী উঁচু নয়। ওটার তালায় চাবি লাগাতেই তালাটা গেল খুলে।

দরজা খুলতেই ওর চোখে পড়ল ছোট্ট সরু একটা পথ, মাটির তলা দিয়ে যাওয়া আসার জন্য ইঁদুর যেমন সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে তেমন। ও হাঁটু গেড়ে বসে যতদূর যায় দৃষ্টিটা মেলে দিল। একটা সুন্দর বাগান। যত্ন করে তৈরি করা রঙ-

বেরঙের ফুল, একটা ফোয়ারা।

অ্যালিসের খুব ইচ্ছে করল ওই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে যাবার, কিন্তু ছোট্ট ওই দরজা দিয়ে ওর মাথাই গলে না।

ও আবার টেবিলটার কাছে ফিরে এল। ওমা, টেবিলের ওপর একটা ছোট বোতল। ওটার গলায় একটা কাগজ সাঁটা, তাতে লেখা রয়েছে, 'পান করার জন্য।' অ্যালিস বোতলে যা ছিল তা একটু চেখে দেখল ভারী মিষ্টি। বোতলটা শেষ করে ফেলল ও।

"আরে, আমি কি ছোট হয়ে যাচ্ছি নাকি!" অ্যালিস ভাবল। সত্যিই কিন্তু ও খুব ছোট্টটি হয়ে গেল। মাথায় মাত্তর দশ ইঞ্চি। এবার ওই ছোট্ট দরজা দিয়ে বাগানে যেতে অসুবিধে হবে না ওর।

"চাবিটা নিয়ে আসি।" মনে মনে ভাবল ও। কিন্তু টেবিলটার কাছে গিয়ে আরেক মুস্কিল। ও যেভীষণছোট্ট হয়ে গেছে, চাবিটা নাগালের মধ্যে আসছে না। টেবিলের একটা পা বেয়ে ও ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাচের পায়া বড্ড পেছল। বেচারী অ্যালিস, বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

একটু পরে মনকে শক্ত করে ও ভাবল, বোকার মত কেঁদে লাভ নেই। ঠিক তখুনি টেবিলের তলায় একটা ছোট কাচের বাক্স চোখে পড়ল ওর। বাক্সটা খুলে ও দেখল ছোট্ট একটা কেক। কেকের ওপর ক্রিম দিয়ে সুন্দর করে লেখা, 'আমাকে খাও।' অ্যালিস আর কি করে, ওটা চটপট খেয়ে নিল।

২

চোখের জলের পুকুর

ভারী আশ্চর্য তো!" আপন মনেই বলল অ্যালিস, "আমি যে ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছি!" দেখতে দেখতে ওর মাথা গিয়ে ঠেকল ঘরের ছাদে। লম্বায় এখন ও ন'ফুটের ওপর। "এবার বাগানে যাওয়া যাক", ও বলল। সোনার চাবিটা নিয়ে ও এগিয়ে গেল সেই ছোট্ট দরজার সামনে।

বেচারী অ্যালিস! ঘরের মধ্যে কাৎ হয়ে শুয়ে কোনমতে একটা চোখ দিয়ে বাগানটাকে ও এখন দেখতে পাচ্ছে। ওই ছোট্ট ফোকর দিয়ে গ'লে যাওয়া এখন অসম্ভব। ওর দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। দেখতে দেখতে অ্যালিসের চারপাশে প্রায় চার ইঞ্চি গভীর জল জমে গেল। মস্ত হল্ ঘরটার আর্ধেকটা জুড়ে যেন ছোট্ট একটা পুকুর।

ছোট ছোট পা ফেলে তাড়াতাড়ি কারও এগিয়ে আসার শব্দে চোখ মুছে ও দেখল সাদা খরগোশটা ফিরে এসেছে। ওর গায়ে সুন্দর পোশাক, এক হাতে এক জোড়া দস্তানা, অন্য হাতে সুন্দর ছোট্ট একটা হাতপাখা।

কোটপরা খরগোশকে দেখছে অ্যালিস

ওর যেন আর তর্ সইছে না। বিড়্ বিড়্ করে বলছে, "ওহো হো, আমার দেরী হলে জমিদার গিন্নী আর রক্ষে রাখবে না।"

অ্যালিস সাহায্যের আশায় একটু এগিয়ে মিষ্টি করে বলল, "খরগোশ মশাই শুনছ···"

কিন্তু অ্যালিসের অত বড় চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল সাদা খরগোশ। দস্তানা জোড়া আর পাখাটা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। বাতাসের মত গতিতে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওটা।

দস্তানা দুটো আর খেলনা পাখাটা কুড়িয়ে নিল অ্যালিস। ঘরে ভ্যাপসা গরম, পাখা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে আপনমনেই অ্যালিস বলল, "আজ সবাই কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার করছে। আমি কি রাতারাতি বদলে গেলাম? তবে আমি কে?"

হঠাৎ ওর খেয়াল হল অন্যমনস্ক ভাবে একটা দস্তানা ও হাতে পরেছে। "আরে আমি আবার ছোট হয়ে যাচ্ছি!" অবাক হয়ে ও বলল। ও এখন লম্বায় মাত্তর দু'ফুট। কিন্তু ছোট হওয়াটা থামছে না। "এটা নিশ্চয়ই এই পাখাটার জন্য," ও ভাবল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিল ওটাকে। সত্যিই কিন্তু ছোট হয়ে যাওয়াটা বন্ধ হল।

"ওঃ, খুব বেঁচে গেছি," ও আবার বলে উঠল, "তবে এবার আমি ওই বাগানে যেতে পারব। ও ছুটে গেল সেই ছোট্ট দরজার কাছে। কিন্তু দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে, আর সোনার চাবিটা রয়েছে কাচের টেবিলের ওপর, এখন ওর নাগালের বাইরে।

"কি ঝামেলায় পড়লাম।" ভাবল বেচারী অ্যালিস। রাগে যেই ও একটা পা মাটিতে ঠুকেছে, অমনি পা পিছলে ঝপাং করে ও পড়ে গেল জলের মধ্যে। লোনা জলে চিবুক পর্যন্ত ডুবে গেল ওর। "আমি বোধহয় সমুদ্রে পড়েছি," ও ভাবল, "ভাগ্যিস আমি সাঁতার জানি।"

আসলে ও কিন্তু পড়েছিল ওরই চোখের জল জমে যে ছোট্ট পুকুরটা হয়েছিল তার মধ্যে। "আমি এত না কাঁদলেই পারতাম," ও ভাবল, "এখন আমার নিজের চোখের জলেই হয়তো ডুবে যাব আমি।"

ঠিক তখুনি জলে ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হল, ওর মত একটা ইঁদুরও জলে পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুরটা নানান জীব জন্তুতে ভরে গেল। একটা হাঁস, একটা ডোড়ো পাখি [এখন আর এ পাখি নেই], একটা তোতা, একটা ঈগল ছানা, একটা নাচিয়ে ক্যানারি পাখি, একটা কাঁকড়া আরও কত কি! অ্যালিস সাঁতার কেটে সবাইকে নিয়ে তীরে উঠল।

জলে ভিজে সবাই সপ্ সপ্ করছে। ডোডো বলল, "তাড়াতাড়ি শুকোতে হলে আমাদের এখন দৌড় দৌড় খেলতে হবে। চটপট একটা ঘর কেটে ফেলল ডোড়ো। সবাই ওই ঘরের চারপাশে সার বেঁধে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হল খেলা। এক, দুই, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওই ঘরের চারপাশে দৌড়তে শুরু করবে, তারপর যে যার খুশীমত চট্ করে দাঁড়িয়ে যাবে। আধঘন্টা ছুটোছুটি করার পর সবাই শুকিয়ে গেল। 'খেলা শেষ', ঘোষণা করল ডোডো। হাঁপাতে হাঁপাতে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো ডোডোকে, জিজ্ঞেস করল "কে জিতেছে? কে পুরস্কার পাবে?"

"সবাই জিতেছে, সবাই পাবে পুরস্কার"। ডোডো জবাব দিল।

"কিন্তু কে দেবে পুরস্কার," সমস্বরে বলল সবাই।

"ও দেবে," অ্যালিসের দিকে আঙুল দেখাল ডোডো। সবাই এবার ঘিরে ধরল অ্যালিসকে, চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "পুরস্কার দাও, পুরস্কার দাও।"

অ্যালিস কি করবে ভেবে না পেয়ে পকেটে হাত ঢোকালো। ওমা, ওর পকেটে ছোট্ট একটা বাক্সে টফি আর লজেন্স। ও সবাইকে ভাগ করে দিল, ওর নিজের কিন্তু কিছু রইল না।

"ওর একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত।" ইঁদুর ভায়া বলল।

"নিশ্চয়ই", ডোডো জবাব দিল, "তোমার পকেটে আর কি আছে?" গম্ভীর মুখে ও প্রশ্ন করল অ্যালিসকে।

"শুধু একটা থিম্‌বল্ [ছুঁচের খোঁচা না লাগার জন্য আঙুলে যে জালটা পরা হয়], অ্যালিস জবাব দিল।

"ওটা দাও আমাকে," ডোডো বলল। সবাই এবার ঘিরে দাঁড়ালো ডোডোকে। ডোডো আনুষ্ঠানিক ভাবে ওটা তুলে দিল অ্যালিসের হাতে, বলল, "দয়া করে এই সুন্দর জিনিসটা তুমি গ্রহণ কর।"

অ্যালিস একটু ঘাড় নুইয়ে থিম্‌বলটা ফিরে নিল, আর সবাই আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিল।

খানিক বাদেই যে যার বাড়ি ফিরে গেল, অ্যালিস আবার একা। তারপরই ও শুনতে পেল কার যেন পায়ের শব্দ।

৩

সাদা খরগোশের বাড়ি

সেই সাদা খরগোশটা, আবার ফিরে এসেছে। ওটা যেন কিছু হারিয়েছে এমনভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিল আর বিড়্ বিড়্ করে বলছিল, "ওহো। আমি ঠিকমত পোশাক না পরলে জমিদার গিন্নি আমাকে আর রক্ষে রাখবে না। কোথায় যে ফেললাম ওগুলো!"

অ্যালিসকে দেখতে পেয়েই খরগোশ চটেমটে বলে উঠল, "মেরী অ্যান্। তুমি এখানে কি করছ? এক্ষুণি বাড়ি যাও, আমার জন্য এক জোড়া দস্তানা আর হাতপাখা নিয়ে এস।"

অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগালো। "খরগোশটা ভাবছে আমি ওর ঝি," ও মনে মনে ভাবল, "যখন বুঝতে পারবে আমি আসলে কে তখন যা মজা হবে! তবে ওর হাত পাখা আর দস্তানা খুঁজে পেলে আমি ওকে পৌঁছে দেব।"

ওর চারপাশে সবকিছুই এখন অন্যরকম। সেই অন্ধকার বড় ঘরটা, কাচের টেবিল, ছোট্ট দরজা, যেন ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে।

বাগানওয়ালা ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ির সামনে এসে পড়ল অ্যালিস। দরজায় চকচকে পেতলের ফলকে লেখা 'সাদা খরগোশ'। বাড়ির ভেতর ঢুকে দোতলায় তর্ তর্ করে উঠে গেল অ্যালিস। একটা ছোট্ট ঘরে টেবিলের ওপর কয়েক জোড়া দস্তানা আর একটা হাত পাখা চোখে পড়ল ওর। আয়নার সামনে একটা ছোট শিশি। ওটার মধ্যে আরকের মত কি যেন ছিল। ছিপি খুলে অ্যালিস সেটা গলায় ঢালল। আধ শিশি ফুরোতে না ফুরোতেই এক কাণ্ড! ও আবার বাড়তে শুরু করল, মাথা গিয়ে ঠেকল ছাদে।

ও তাড়াতাড়ি শিশিটা নামিয়ে রাখল। "কি করে আমি এখন দরজা দিয়ে বেরুব?" মনে মনে ভাবল ও।

ও কিন্তু মাথায় বেড়েই চলেছে। প্রথমে ও হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর শুয়ে পড়ল। একটা হাত বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে, একটা পা ঠেকল

ছাদের চিমনিতে। ওর ভাগ্য ভাল, ওখানেই শেষ হল বোতলের ম্যাজিকের খেলা।

খুব খারাপ লাগছিল অ্যালিসের, মনে মনে ভাবছিল, "বাড়িতেই ভাল ছিলাম আমি। সারাক্ষণ এমন লম্বা আর ছোট হবার বালাই ছিল না। সাদা খরগোশটার পেছনে না দৌড়ুলেই ভাল ছিল।"

"মেরী অ্যান্! মেরী অ্যান্! জলদি আমার দস্তানা এনে দাও।" খরগোশটার রাগ্ রাগ্ গলা শুনে ভয় হল অ্যালিসের। তারপরই মনে পড়ল ও এখন মস্ত বড়, একটা ছোট খরগোশকে ভয় করার কিছু নেই।

খরগোশটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করল, কিন্তু অ্যালিসের কনুই ওটাকে চেপে রাখায় তা সম্ভব হল না। অ্যালিস শুনতে পেল খরগোশটা বলছে, "আমি জানালা দিয়ে ঢুকব।"

"চেষ্টা করে দেখ", মনে মনে হাসল অ্যালিস। খরগোশটা জানালার ঠিক নিচে এসেছে বুঝতে পেরে ও শূন্যে খপ্ করে হাতটা মুঠো করে ছেড়ে দিল। একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল ওর কানে। তারপরই কিছু একটা পড়ে যাবার আর কাচ ভাঙ্গার শব্দ।

"প্যাট্, প্যাট্, কোথায় তুমি? কি করছ?" খরগোশটা রাগে বলে উঠল।

"আপেলের জন্য মাটি খুঁড়ছি কত্তামশাই।"

"আপেলের জন্য মাটি খুড়ছি!" ভেচে উঠল খরগোশ, "এদিকে এস, জানলায় ওটা কি বল আমাকে।"

"ওটা একটা হাত, কত্তামশাই," প্যাট্ এবার জবাব দিল।

"হাত না ছাই, বোকা কোথাকার! অতবড় হাত হয় নাকি! গোটা জানলাটা জুড়ে আছে।"

"ওটা একটা হাতই, কত্তামশাই।"

"তা হোক, ওটার ওখানে থাকার নিয়ম নেই। যাও ওটাকে সরিয়ে দাও।"

অ্যালিস একটু অপেক্ষা করল, তারপর আবার হাতটা খপ্ করে মুঠো করে ছেড়ে দিল। আবার কিছু পড়ে যাবার আর সেই সঙ্গে একটা ভয় পেয়ে চিৎকারের শব্দ ভেসে এল ওর কানে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর অনেকের গলা শোনা গেল, "মইটা কোথায়? দড়ি কোথায়? তুমি মই বেয়ে ছাদে ওঠ, চিমনি দিয়ে নেমে যাও।"

একটু পরেই ছাদে চিমনির মুখে ছোট একটা জন্তুর খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল। অ্যালিস জোরে একটা লাথি কষালো।

একটা গোলমাল শোনা গেল। "বিল্ পড়ে যাচ্ছে, ধর ওকে, জল দাও মাথায়।"

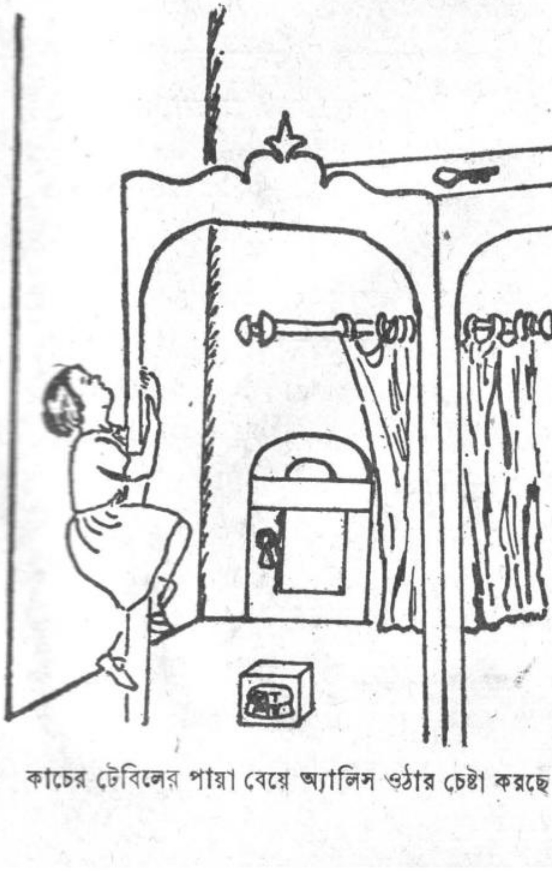

কাচের টেবিলের পায়া বেয়ে অ্যালিস ওঠার চেষ্টা করছে

"এবার ওরা কি করবে কি জানি!" অ্যালিস ভাবল। ওকে অপেক্ষা করতে হল না, জানলা দিয়ে এক পশলা নুড়ি ভেতরে এসে পড়ল। অ্যালিস অবাক হয়ে দেখল নুড়িগুলো ছোট ছোট কেক হয়ে যাচ্ছে।

ও একটা কেক নিয়ে কামড় দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটা আবার ছোট হতে শুরু করল। দরজা দিয়ে বেরুবার মত যেই ওর শরীরটা ছোট হল। ও বেরিয়ে ছুট্ লাগালো।

বাইরে পাখি আর জন্তুতে একটা ভিড় জমে উঠেছে। দুটো গিনিপিগ্ বিল্‌কে ধরে আছে, বিল্ হল একটা টিকটিকি। ওরা সবাই তাড়া করল অ্যালিসকে।

দে ছুট্ দে ছুট্, একটা গভীর বনে ঢুকে পড়ল অ্যালিস।

৪
শুয়োপোকার উপদেশ আর পায়রার সঙ্গে কচকচি

বনের মধ্যে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অ্যালিস। কিন্তু ও এখন বড্ড ছোট, ওর চারপাশে সব কিছুই বড়। "আমার যেমনটি লম্বা হওয়া উচিত তেমনটি হতে হবে," ও ভাবল, "কিন্তু কেমন করে তা হবে?"

ওর চারপাশে বুনো ফুল আর ঘাস, কিছু খেয়ে যে বড় হবে তেমন কিছু চোখে পড়ল না। তারপরই একটা ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেল ও। ওটা মাথায় ওরই মত। ওটার ওপর একটা বড় নীল শুয়োপোকা দু'হাত ভাঁজ করে বসে গড়গড়া টানছে।

"তুমি কে?" শুয়োপোকা জিজ্ঞেস করল।

"আমি ঠিক জানি না," অ্যালিস একটু লজ্জা পেয়ে বলল। "আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি কি ছিলাম তা জানি, কিন্তু তারপর অনেকবার বদলে গেছি।"

"কি বলছ তুমি?" "শুয়োপোকা কঠিন গলায় বলল, "সত্যি কথা বল?"

"আমি নিজেই জানি না। সত্যি কথা কি বলব।" অ্যালিস জবাব দিল, "এক দিনেই আমার চেহারা এতবার বদল হয়েছে যে, আমি নিজে কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।"

কয়েক মুহূর্ত আর কোন কথা নেই। "ও আমাকে সাহায্য করবে না।" অ্যালিস ভাবল, যাবার জন্য পেছন ফিরল ও।

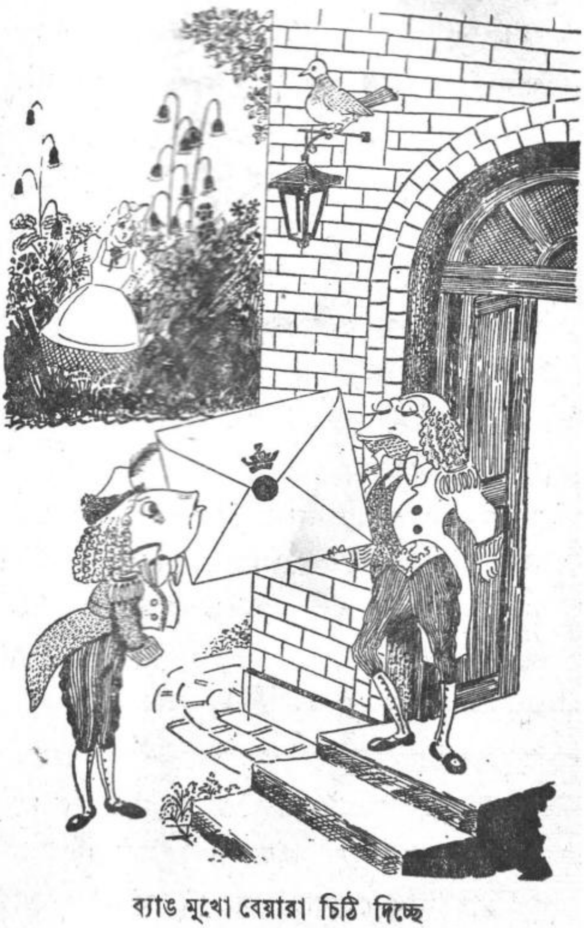

ব্যাঙ মুখো বেয়ারা চিঠি দিচ্ছে

"যেওনা, দাঁড়াও।" শুয়োপোকা বলে উঠল, "তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।"

অ্যালিস আবার ঘুরে দাঁড়ালো।

"অত রাগ ভাল নয়", শুয়োপোকা বলল, তারপর মুখ থেকে গড়গড়ার নল্‌টা সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কত বড় হতে চাও তুমি ?"

"আরেকটু বড়" অ্যালিস জবাব দিল, "তিন ইঞ্চি বড্ড ছোট।"

"ওটাই ঠিক", ওটা নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল, মাথায় ওটাও তিন ইঞ্চি।

"তোমার পক্ষে ঠিক হতে পারে", অ্যালিস বলল, "কিন্তু আমি ছোট মেয়ে, আমার পক্ষে বেমানান।" শুয়োপোকা গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর ওটা পাশে রেখে নেমে পড়ল মাটিতে। ঘাসের ওপর দিয়ে সর্ সর্ করে চলতে চলতে ওটা বলল, "এক পাশ তোমাকে লম্বা করবে অন্য পাশ করবে ছোট।"

"কিসের এক পাশ, অন্য পাশটাই বা কি ?" অ্যালিস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ব্যাঙের ছাতার", জবাব দিয়েই ঘন ঘাসের মধ্যে মিলিয়ে গেল শুয়োপোকাটা।

ব্যাঙের ছাতাটা গোল। অ্যালিস দুহাতে ওটাকে জড়িয়ে দুটো টুকরো ভেঙ্গে ফেলল।

"কোন্‌টা কোন্ পাশ বুঝব কেমন করে।" অ্যালিস ফাঁপরে পড়ল, তারপর ডান হাতের অংশটা থেকে একটু কামড় দিল। পরমুহূর্ত্তে ওর মনে হল চিবুকে কেউ যেন ঘুসি মেরেছে। ভীষণ ভয় হল ওর। কষ্ট করে হাঁ করে বাঁ হাতের অংশটায় কামড় দিল। তারপরই ঘটে গেল অদ্ভুত এক পরিবর্ত্তন। ওর কাঁধ দুটো আর দেখা যাচ্ছে না, মস্ত এক গলা, ওর অনেক নিচে যেন সবুজ পাতার সমুদ্র।

"আমার কাঁধ কোথায় গেল !" অ্যালিস প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। "আমার হাত দুটোও দেখতে পাচ্ছি না।"

ও কিন্তু ওর লম্বা গলাটা যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাতে পারছে। ও নিচু হয়ে সবুজ পাতার মধ্যে মাথাটা নিয়ে এল। ওগুলো গাছের মাথা, তার তলা দিয়েই বনের মধ্যে ও হাঁটছিল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আঘাতে তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিলও। একটা পায়রা উড়ে এসে পাখা দিয়ে ওর মুখে ঝাপটা মারছে।

"সাপ, সাপ !" পায়রাটা চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি মোটেই সাপ নই", অ্যালিস রেগে বলল।

"হ্যাঁ, সাপইতো", পায়রাটা এবার কান্না ভেজা গলায় বলল, "আমি সব রকম চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।"

"তোমার কথার মাথা-মুণ্ডু আমি বুঝতে পারছি না", অ্যালিস বলল।

"আমি গাছের কোটরে, ঝোপে, দেওয়ালের খুপরিতে, যেখানেই লুকিয়ে বাসা করেছি, সাপখুঁজে বের করেছে।"

অ্যালিস তবু কিছু বুঝতে পারল না, তাই চুপ করে রইল।

"আমি কত কষ্ট করে ডিমে তা দিই," পায়রাটা বলে চলল," দিনরাত আমাকে সাপের জন্য পাহারা দিতে হয়। তিন সপ্তাহ ধরে আমি ঘুমুইনি।"

তিন মালি—দুই, সাত ও পাঁচ

অ্যালিস এবার বুঝতে পারল। মা পায়রাটা ওটার ডিম আর ছানাদের পাহারা দিচ্ছে। "তোমার জন্য আমি দুঃখিত," ও না বলে পারল না।

"এবার আমি সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় বাসা বেঁধেছি," পায়রাটা এবার একটু গলা তুলে বলল, "ভেবেছিলাম সাপ এখানে আসবে না। কিন্তু এখানেও আকাশ থেকে গড়িয়ে নেমে এল। সাপ কোথাকার!"

"আমি বলছি, আমি সাপ নই," অ্যালিসের রাগ হল, "আমি ছোট একটা মেয়ে।"

"আহা, কি গপ্পই না ফেঁদেছ।" পায়রাটা বিদ্রূপ করে উঠল। "আমি অনেক ছোট মেয়েই দেখেছি, কিন্তু কারও সাপের মত অমন গলা নয়। এবার হয়তো তুমি বলবে, তুমি কখনও ডিম খাওনি।"

"ডিম খাবনা কেন!" অ্যালিস সত্যি কথাই বলল, "ছোট মেয়েরাতো ডিম খায়।"

"তা যদি খায় তবে তারাও একরকম সাপ," পায়রাটা রায় দিল। "তুমি যে ডিমের খোঁজেই এখানে এসেছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

"মোটেই না," অ্যালিস প্রতিবাদ করে বলল, "আর তা যদি হত, তোমার ডিম আমি খেতাম না। কাঁচা ডিম আমি পছন্দ করি না।"

"তবে এখান থেকে চলে যাও," বেশ রাগ করে কথাটা বলে পায়রাটা আবার ডিমে তা দিতে বসল।

অ্যালিসের হাতে তখনও সেই ব্যাঙের ছাতার দুটো টুকরো ছিল। ও খুব সাবধানে একবার এটা থেকে একটু ওটা থেকে একটু ভেঙে মুখে পুরতে লাগল। একবার ও লম্বা হচ্ছে, তারপরই বেঁটে। যাহোক শেষ পর্যন্ত নিজেকে ও আসল চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

৫

শুওরছানা আর গোলমরিচের গুঁড়ো

বন থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল অ্যালিস, সামনেই ছোট্ট একটা বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে নানা রকম শব্দ ভেসে আসছিল। একজন অদ্ভুত চেহারার বেয়ারা ছুটে দরজার কাছে এল। ওর গায়ে উর্দি, কিন্তু মাথাটা ব্যাঙের মত। হাতে একটা লেফাফা। দরজায় জোরে জোরে কড়া নেড়ে লেফাফাটা ও ভেতরে গলিয়ে দিয়ে বলল, "রাণীর সঙ্গে বল খেলার জন্য জমিদার গিন্নির নেমন্তন্ন।"

একটা রেকাবি কে যেন ভেতর থেকে ছুঁড়ে মারল। অল্পের জন্য মাথাটা বেঁচে গেল বেয়ারার। ব্যাঙ বেয়ারা এক ছুটে পালিয়ে গেল, দরজাটাও গেল বন্ধ হয়ে।

"রাজা-রাণীর পরেই জমিদার আর জমিদার গিন্নি-দের আসন," অ্যালিস ভাবল. "তাদের থাকা উচিত মস্ত বাড়িতে। এখানে সব কিছুই উলটো।" ভেতরে কি হচ্ছে দেখবার জন্য খুব কৌতূহল হল অ্যালিসের। দরজার কড়া না নেড়ে ও দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দরজা দিয়ে গিয়েই বড় একটা রান্নাঘর, ধোঁয়ায় ভর্তি। জমিদার গিন্নি ঘরের মাঝখানে একটা তেপায়া টুলে একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। রাঁধুনি উপুড় হয়ে উনুনের উপর বসানো একটা বড় ডেক্‌চিতে স্যুপ নাড়াচাড়া করছিল। "স্যুপে বড্ড বেশী গোলমরিচের গুঁড়ো দেয়া হয়েছে।" অ্যালিস নিজের মনেই বলল তারপরই শুরু করল হাঁচতে।

বাতাসেও গোলমরিচের গুঁড়োর গন্ধ। জমিদার গিন্নি মাঝে মাঝে হাঁচছিলেন, বাচ্চাটা না থেমে

হাঁচছিল আর কাঁদছিল। শুধু রাঁধুনি আর মস্ত একটা বেড়াল একবারও হাঁচছিলনা। বেড়ালটা উনুনের সামনে বসেছিল আর দাঁত বার করে হাসছিল।

"বেড়ালটা অমন হাসছে কেন?" অ্যালিস না জিজ্ঞেস করে পারলনা।

"ওটা দাঁত বার করা বেড়াল তাই অমন হাসছে," জমিদার গিন্নি জবাব দিলেন।

ঠিক তখুনি রাঁধুনি উনুন থেকে ডেকচিটা নামিয়ে জমিদার গিন্নি আর বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে জিনিস পত্তর ছুঁড়তে লাগল।

প্রথমে সাঁড়াশি তারপর গামলা, থালা, রেকাবি, বৃষ্টির মত পড়তে লাগল সব। জমিদার গিন্নির গায়ে এসে পড়ছিল কিন্তু তিনি যেন লক্ষ্যই করছিলেননা।

"সাবধান, সাবধান," অ্যালিস লাফিয়ে উঠল, ওর ভয় হতে লাগল বাচ্চাটা ব্যথা পাবে।

তখুনি একটা বড় গামলা বাচ্চাটার প্রায় নাক উড়িয়ে ঝন্ ঝন্ করে মাটিতে পড়ল। অ্যালিস আবার চেঁচিয়ে উঠল।

"তুমি যদি ইচ্ছে কর, বাচ্চাটাকে ধরতে পার", জমিদার গিন্নি ওর কোলে বাচ্চাটাকে গছিয়ে বললেন, "আমাকে এখুনি রাণীর সঙ্গে বল খেলতে যেতে হবে।"

বাচ্চাটাকে কোলে নিতে অ্যালিসের অসুবিধেই হচ্ছিল। ওটা চার হাত-পা সব দিকে ছুঁড়ছিল। অ্যালিস ওকে শক্ত করে ধরে বাইরে বেরিয়ে এল। বাচ্চাটার হাঁচি থেমেছিল, কিন্তু ওটা অদ্ভুত একটা শব্দ করছিল। অনেকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের মত।

"অমন শব্দ করেনা।" অ্যালিস শাসনের সুরে বলল, "বাচ্চাদের অমন শব্দ মানায় না।"

কিন্তু বাচ্চাটা থামেইনা, ওই একই শব্দ করে যাচ্ছে। অ্যালিস ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকাল। ওর নাকটা যেন কেমন লম্বা, চোখ দুটো ভীষণ ছোট ছোট। তারপরই অ্যালিস বুঝতে পারল ওটা আসলে মানুষের বাচ্চা নয়, একটা শুওর ছানা। ওটাকে মাটিতে নামিয়ে দিতেই, ছুটে বনের ভেতর ঢুকে গেল।

আরেকটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালো অ্যালিস। একটা গাছের ডালে বসে আছে সেই দাঁত বার করা বেড়ালটা। অ্যালিসকে দেখে ওটা এ কান থেকে ও কান বিস্তার করে হাসল।

"আমি এখান থেকে কোন্‌দিকে যাব, দয়া করে বলে দেবে?" অ্যালিস নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

"ওদিকে," বেড়ালটা ডান থাবা নাড়িয়ে বলল, "টুপিও'লার বাড়ি," তারপর বাঁ থাবা নাড়িয়ে বলল, "ওদিকে হল চৈত্ খরগোশের বাসা। দুজনের যে কোন জনের সঙ্গে তুমি দেখা করতে পার, দুজনেই পাগল। তুমি কি আজ রাণীর সঙ্গে কাঠের বল খেলা করতে যাবে?"

ব্যাঙের ছাতার ওপরে শুয়োপোকা তামাক খাচ্ছে

রাণীতো আমাকে বলেননি," অ্যালিস জবাব দিল।

"ওখানে তুমি আমার দেখা পাবে," কথাটা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল বেড়ালটা।

পরমুহূর্তে গাছের ডালে আবার দেখা দিয়ে ওটা অ্যালিসকে জিজ্ঞেস করল," বাচ্চাটার কি হল ?"

"ওটা একটা শূওর ছানা হয়ে গেছে," অ্যালিস জবাব দিল।

"আমিও ভেবেছিলাম তাই হবে" আবার অদৃশ্য হয়ে গেল বেড়ালটা।

বেড়ালটাকে আর দেখতে না পেয়ে অ্যালিস হাঁটা দিল। "টুপিওলা আমি আগে দেখেছি," আপন মনেই ও বলল, "চৈত খরগোশ নিশ্চয়ই মজার হবে।"

কথাটা বলেই ওপর দিকে তাকিয়ে ও দেখল অন্য গাছের ডালে বেড়ালটা বসে আছে।

"তুমি কি বললে শূওর ছানা, না কুকুর ছানা ?" বেড়ালটা জিজ্ঞেস করল।

"শূওর ছানা," অ্যালিস জবাব দিল, "তুমি অমন ভাবে ফস্ করে মিলিয়ে যাচ্ছ আবার দেখা দিচ্ছ, আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে।"

"ঠিক আছে," বেড়ালটা বলল। এবার ও খুব আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে লাগল। লেজের শেষ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরটা একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে লাগল, সব শেষে রইল ওটার দাঁত বার করা হাসি। কিছুক্ষণ ওটা শূন্যে ভেসে রইল তারপর ওটাও মিলিয়ে গেল।

"দাঁত বার করা হাসি ছাড়া বেড়াল আমি দেখেছি", অ্যালিস ভাবল, "কিন্তু বেড়াল ছাড়া দাঁত বার করা হাসি! জীবনে এমন আশ্চর্য জিনিস আমি দেখিনি!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চৈত্ খরগোশের বাড়ির কাছে এসে পড়ল অ্যালিস। বাড়ির চিমনিগুলো লম্বা কানের মত, লোমে ছাওয়া ছাদ।

ও একটু ভয়ে ভয়েই বাড়ির দিকে এগুলো, মনে মনে ভাবল, ওটা যদি ক্ষ্যাপা পাগল হয় তবেই গেছি!

৬

হুল্লোড়ে চায়ের আসর

চৈত্ খরগোশ আর টুপিওলা, দুজনেরই কিন্তু দেখা পেয়ে গেল অ্যালিস। সামনে একটা গাছের তলায় টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। টুপিওলা আর পাট্কিলে রঙের চৈত খরগোশ চা খাচ্ছিল।

চায়ের টেবিলে অ্যালিস

ওদের দুজনের মাঝখানে টেবিলের ওপর বসে ঘুমোচ্ছিল একটা কাঠবেড়াল।

টেবিলটা বড় হলেও ওরা এক কোণায় ভিড় করেছিল। অ্যালিসকে আসতে দেখে দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল, "জায়গা নেই, জায়গা নেই।"

"অনেক জায়গা আছে", অ্যালিস রাগ করেই জবাব দিল। টেবিলের এক প্রান্তে একটা আরাম কেদারায় বসে পড়ল ও।

"একটু লেমনেড খাও," চৈত্ খরগোশ বলল।

অ্যালিস তাকিয়ে দেখল টেবিলে চা ছাড়া আর কিছু নেই। "আমিতো লেমনেড্ দেখছিনা" ও বলল।

"হ্যাঁ, তা নেই", চৈত্ খরগোশ ঘাড় দোলালো।

"যা নেই তা খেতে বলা মোটেই ভদ্রতা নয়," অ্যালিস একটু চড়া গলায় বলল।

"আমাদের অনুমতি ছাড়াই এখানে বসে পড়া তোমার পক্ষে ভদ্রতার কাজ হয়নি।" চৈত্ খোরগোশ বলল।

"এটা যে তোমাদের টেবিল তা আমার জানা ছিল না," অ্যালিস জবাব দিল, "তিনজনের চাইতে অনেক বেশী লোকের জায়গা আছে এখানে।"

টুপিও'লা এতক্ষণ অ্যালিসকে দেখছিল, এবার বলল, "তোমার চুল ছাঁটা দরকার।"

"কারো সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্য করা উচিত নয়", অ্যালিস রেগে উঠল, "ওটা অভদ্রতা।"

টুপিও'লা চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "একটা দাঁড়কাক একটা ছোট্ট টেবিলের মত কেন?"

অ্যালিস মনে মনে খুশী হল, হেঁয়ালি প্রশ্নের জবাব ওর কাছে একটা মজার খেলা।

"আমি বোধহয় আঁচ করতে পারব," ও বলল।

"তুমি কি বলতে চাইছ, প্রশ্নটার জবাব দিতে পারবে?" চৈত্ খরগোশ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ", অ্যালিস জবাব দিল।

"তবে তাই তোমার বলা উচিত", চৈত্ খরগোশ আবার বলল।

"তাই বলছি", তাড়াতাড়ি বলে উঠল অ্যালিস, "মানে ওই একই হল!"

"মোটেই না।" টুপিও'লা বলল, "আমি যা খাই তা দেখি, আর আমি যা দেখি তা খাই, এক নয়।"

"আমি যা পাই তাই আমার ভাল লাগে, আর আমার যা ভাল লাগে আমি তাই পাই, এক নয়," চৈত্ খরগোশ টিপ্পনি কাটল। কাঠবেড়াল এবার চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলে উঠল," আমি যখন ঘুমুই তখন আমি নিশ্বাস নিই, আর আমি যখন নিশ্বাস নিই তখন ঘুমুই, এক নয়।"

"তোমার বেলায় এক," টুপিও'লা বলল।

অ্যালিস হেঁয়ালির জবাবটা ভাবছিল, টুপিওলা ওর দিকে ফিরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আজ মাসের কত তারিখ?"

"চার," অ্যালিস একটু ভেবে বলল।

"উঁহু, দুটো দিন আগে পিছে হয়ে গেল।"

টুপিওলা অ্যালিসের সঙ্গে তর্ক করছে

পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে টুপিও'লা কয়েকবার ঝাঁকালো, তারপর কানে তুলে ধরে চৈত্ খরগোশকে লক্ষ্য করে বলল, "আমি বলেছিলাম ভেতরে মাখন দিলে কাজ হবে না।"

চৈত্ খরগোশ ঘড়িটা নিজের চায়ের পেয়ালায় ডোবালো. তারপর আবার বলল, "এটাই ছিল সেরা মাখন।"

"কাঠবেড়ালটা আবার ঘুমিয়েছে," টুপিও'লা বলল, তারপর একটু গরম চা ঢেলে দিও ওর নাকে।

কাঠবেড়াল মাথা দু'পাশে ঝাঁকালো, চোখ দুটো না খুলেই বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কি যেন বলেছিলাম আমি?"

"হেঁয়ালিটার উত্তর খুঁজে পেয়েছ?" টুপিও'লা অ্যালিসকে জিজ্ঞেস করল।

"না" অ্যালিস জবাব দিল, "কি হবে এটা?"

"আমার কোন ধারণাই নেই।" জবাব দিল টুপিও'লা। "আমারও তাই," যোগ করল চৈত্ খরগোশ।

"হয়তো ওটার কোন জবাব নেই।" টুপিও'লা এবার বলল।

"যে হেঁয়ালির কোন জবাব নেই তা নিয়ে সময় নষ্ট কর কেন তোমরা?" অ্যালিস অধৈর্যের সঙ্গে বলল।

"এবার একটু গান হোক," হাই তুলে বলল চৈত্ খরগোশ, "ওই ঝিকমিক ঝিকমিক গানটা গাও," টুপিও'লাকে বলল ও।

টুপিও'লা অমনি গান ধরল :

"ঝিকমিক ঝিকমিক
ছোট্ট বাদুড়—
হারিয়ে গিয়েছে তোমার
মনের মাদুর।

এই গানটা আগে শুনেছ?" অ্যালিসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল টুপিও'লা।

"অনেকটা ও'রকম", অ্যালিস জবাব দিল, "ঝিকমিক ঝিকমিক ছোট্ট তারা···বাদুড় কি ঝিকমিক করে?"

"না, তা করে না, গানের বাকিটুকু শোন," টুপিও'লা আবার গান ধরল :

"উড়ে উড়ে যাও তুমি কত উঁচু আকাশে
চায়ের বারকোশ ভাসে যেন বাতাসে।"

"লোকটা চা ছাড়া আর কিছু জানেন না।" অ্যালিস মনে মনে ভাবল।

"কাঠবেড়াল ভায়া এবার আমাদের একটা গল্প

রাজ দরবারে টুপিওলা সাক্ষ্য দিচ্ছে

শোনাবে," চৈত্ খরগোশ বলল, "এ যে আবার ঘুমিয়ে পড়ল !"'

টুপিও'লা আর চৈত্ খরগোশ দুদিক থেকে দু'জনে চিমটি কাটল কাঠবেড়ালকে।

কাঠবেড়াল আস্তে আস্তে চোখ খুলে ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "আমি ঘুমুইনি, তোমরা যা বলছিলে সব শুনেছি।"

"আমাদের একটা গল্প বল," চৈত্ খরগোশ বলল। "হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি শুরু কর নইলে আবার তুমি ঘুমিয়ে পড়বে," টুপিও'লা সাবধান করে দিল।

"অনেকদিন আগে তিনটি বোন ছিল," কাঠবেড়াল তাড়াতাড়ি শুরু করল, "তারা একটা কুয়োর তলায় থাকত।"

"কি খেত ওরা ?" অ্যালিস জিজ্ঞেস করল।

"গুড়," দু-এক মিনিট ভেবে জবাব দিল কাঠবেড়াল।

"শুধু গুড় খেলে অসুখ করবে না ?" অ্যালিস প্রতিবাদ না করে পারল না।

"ওদের অসুখ করেছিল," কাঠবেড়াল জবাব দিল, "খুব অসুখ করেছিল।"

"ওরা কেন কুয়োর তলায় থাকতে গেল ? "অ্যালিস আবার প্রশ্ন করল।

"আরেকটু চা খাও", চৈত্ খরগোশ আন্তরিকভাবে অ্যালিসকে বলল।

"আমি মোটেই চা খাইনি," অ্যালিস অপমানিত বোধ করল, "আরেকটু খাবার কথা আসে কেন ?" ওরা এতক্ষণ বলেনি তাই ও চা ছোঁয়নি পর্যন্ত, কিন্তু এবার ও এক পেয়ালা চা আর মাখন মাখানো রুটি টেনে নিল। তারপর আবার প্রশ্নটা করল ও।

"তুমি যদি বার বার বাধা দাও তবে গল্পটা তুমিই শেষ কর," কাঠবেড়াল এবার গোমড়া মুখ করে বলল।

"না, না, আর আমি বাধা দেব না, তুমি বল' অ্যালিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

"ওই তিন বোন আঁকতে শিখছিল," কাঠবেড়াল আবার শুরু করল।

"কি আঁকতে শিখছিল ?" অ্যালিস ওর প্রতিজ্ঞা ভুলে প্রশ্ন করল।

"গুড়," কাঠবেড়াল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

"আমি বুঝতে পারছিনা,'' অ্যালিস আবার বলে উঠল, "কি দিয়ে গুড় আঁকছিল ?"

"তুমি যদি কুয়োর জল থেকে জল তুলতে পার, তবে গুড় দিয়ে গুড় আঁকা যাবে না কেন ? বোকা মেয়ে।" টুপিও'লা বলল।

"ওরা আঁকতে শিখছিল," কাঠবেড়াল হাই তুলে আর দু'চোখ রগড়ে বলল। ঘুমে আবার ও ঢুলে পড়ছে। ''ম' দিয়ে শুরু এমন সব কিছুই ওরা আঁকছিল।"

"'ম' দিয়ে কেন ? অ্যালিস বলল।

"কেন নয় ?" চৈত খরগোশ ধমকে উঠল।

কাঠবেড়াল আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। টুপিও'লা জোরে একটা চিমটি কাটতেই ও 'উঃ' করে উঠে, শুরু করল, "ম' দিয়ে যা কিছু হয়, ময়ূর, মধু, ময়দা। ময়দার ছবি দেখেছ তুমি ?"

অ্যালিস কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল; বলল, "না, মানে, আমার মনে হয় না—"

"যদি মনে না হয় তবে চুপটি করে থাক, "বক্ বক্ ক'র না," টুপিও'লা রুক্ষ গলায় বলে উঠল।

অ্যালিসের খুব রাগ হল। "জীবনে আমি এমন বোকা চায়ের আসর দেখিনি," বলেই ও উঠে গট্গট্ করে হাঁটা দিল।

কাঠবেড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল ঘুমে। অ্যালিস খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকালো। ও আশা করেছিল টুপিও'য়ালারা হয়তো ওকে

ডাকবে। কিন্তু ওরা ওকে যেন লক্ষ্যই করল না। শেষবার যখন ও ফিরে তাকালো, দেখল কাঠবেড়ালকে ওরা চায়ের পটে ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

অ্যালিস বনের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। একটা গাছের গায়ে দরজা দেখে ও থমকে দাঁড়ালো।

"আশ্চর্য!" মনে মনে ভাবল ও, "আজ সবই অদ্ভুত।"

দরজা দিয়ে ঢুকে ও আরও অবাক। আবার সেই অন্ধকার বড় ঘরটায় ও ফিরে এসেছে।

"এবার আর আমার ভুল হবে না।" আপন মনেই ও বলল। কাচের টেবিলটা থেকে সোনার চাবিটা নিয়ে ও ছোট্ট দরজাটা খুলে ফেলল।

সেই ব্যাঙের ছাতার টুকরো ও পকেটে রেখে দিয়েছিল, আস্তে ওটাতে একটু কামড় দিতেই আবার ছোট্ট হয়ে গেল ও।

৭
রাণীর খেলার মাঠ

সরু পথটা দিয়ে একেবারে বাগানে গিয়ে পড়ল অ্যালিস। একটা মস্ত গোলাপের ঝোপ চোখে পড়ল ওর। সাদা গোলাপে ভরে আছে ঝোপটা, তিন জন মালি ওগুলো লাল রঙ করছে।

আরও মজার ব্যাপার হল, মালিদের শরীর অনেকটা তাসের মত, তাদের গায়ে লেখা রয়েছে হরতনের দুই, পাঁচ আর সাত।

"তোমারা গোলাপগুলো অমন রঙ করছ কেন?" অ্যালিস জিজ্ঞেস করল ওদের।

"ব্যাপারটা হল," হরতনের দুই জবাব দিল, "এখানে একটা লাল গোলাপ বসাবার কথা ছিল, কিন্তু আমরা ভুল করে সাদা গোলাপ লাগিয়েছি। রাণী দেখতে পেলে আমাদের মাথা কেটে নেবেন। তাই তিনি আসার আগেই আমরা ওগুলো রঙ করে দিচ্ছি।"

ঠিক তখুনি পাঁচ চেঁচিয়ে উঠল, "রাণী আসছেন, রাণী আসছেন।" ওরা তিনজন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। রাণীকে দেখার আশায় উৎসুক হয়ে উঠল অ্যালিস।

প্রথমে গদা হাতে এল দশজন সৈন্য, ওদের শরীরও মালিদের মত, আয়ত-চৌকাণা আর সমতল। তারপর সার বেঁধে এল দশজন পারিষদ, তাদের পোশাক লাল রুহিতন। তাদের পর এল দশজন রাজপরিবারে ছেলেমেয়ে তারা এসেই হুটোপুটি লাগিয়ে দিল। তাদের গায়ে হরতনের পোশাক। তারপর এল মান্য অতিথিরা। তাদের মধ্যে সাদা খরগোসকেও দেখতে পেল অ্যালিস। তাদের পেছন পেছন দেখা গেল হরতনের গোলামকে। রাজার মুকুট আর একটা মখমলের তাকিয়া বয়ে নিয়ে আসছিল সে। সবার শেষে এল হরতনের রাজা আর রাণী।

তাসের রাজার বিচার সভা

শোভাযাত্রা অ্যালিসের কাছে পৌঁছুতেই সবাই দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালো। রাণী গোলামের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে এই মেয়েটা?" গোলাম একটু হেসে মাথা নোয়ালো।

"বুদ্ধু কোথাকার!" রাণী বললেন, তারপর অ্যালিসের দিকে ফিরে বললেন, "কি নাম তোমার?"

"আমার নাম অ্যালিস", গলা মোলায়েম করে জবাব দিল অ্যালিস আর মনে মনে ভাবল, "এরা তাসের রাজা-রাণী, আমার ভয় পাবার কিছু নেই।"

"এরা কে?" উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা মালি তিনজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হরতনের রাণী।

"আমি কি করে জানব?" অ্যালিস নির্ভয়ে জবাব দিল, "আমার কি দরকার জেনে!"

রাণীতো চটে মটে লাল, হুকুম করলেন, "ওর গর্দান নাও, এখুনি।"

"বাজে কথা ব'লনা", অ্যালিস প্রায় ধমকে উঠল, আর রাণী গেলেন চুপ হয়ে।

রাজা তখন রাণীকে নরম গলায় বললেন, "ও বাচ্চা মেয়ে, ওর কথা ধ'রনা"।

রাণী রেগে ছিটকে দূরে সরে গেলেন, তারপর গোলামকে আদেশ করলেন, "ওদের উলটে দাও।" গোলাম একটা পা দিয়ে মালিদের একে একে উলটে দিল। "উঠে দাঁড়াও", রাণী তীক্ষ্ণ গলায় বললেন। মালি তিনজন লাফিয়ে উঠে রাজা-রাণী, রাজপরিবারের ছেলে-মেয়ে, অতিথিদের এবং যারা ওখানে ছিল সবাইকে সেলাম জানাতে লাগল।

"থাম এবার", রাণী ধমকে উঠলেন, "তোমাদের হাবভাবে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।" তারপরই গোলাপ ঝাড়ের দিকে ফিরে রঙের পাত্র আর তুলি লক্ষ্য করে রাণী জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কি? কি করছ তোমরা এখানে?"

"দয়া করুন মহারাণী," দুই হাঁটু গেড়ে খুব নরম গলায় বলল, "আমরা চেষ্টা করছিলাম—"

"হুঁ বুঝেছি," গোলাপ ফুলের দিকে তাকিয়ে রাণী এবার ঘাড় দোলালেন, তারপর ফরমান জারি করলেন, "ওদের মাথা কেটে ফেল।"

শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল, শুধু তিনজন সৈন্য রাণীর হুকুম পালন করার জন্য পেছনে রয়ে গেল। মালি তিনজন ভয়ে অ্যালিসের পেছনে লুকালো।

"আমি তোমাদের বাঁচাবো, ভয় নেই", অ্যালিস ওদের ভরসা দিল, তারপর কাছেই দাঁড় করানো

বিচার সভা থেকে জমিদার গিন্নির রাঁধুনি পালাচ্ছে

মস্ত একটা ফুলের টবে লুকিয়ে রাখল ওদের। সৈন্য তিনজন কয়েক মিনিট এদিক ওদিক ওদের খুঁজল, তারপর কদম কদম পা ফেলে এগিয়ে গেল।

"ওদের গর্দান নিয়েছ ?" রাণী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"ওদের গর্দান আর নেই মহারাণী", সৈন্যরা এক সাথে জবাব দিল।

"বেশ! কাঠের বল খেলা জান ?" অ্যালিসকে প্রশ্ন করলেন রাণী।

"হ্যাঁ, জানি।"

"তবে এসো আমাদের সঙ্গে।"

অ্যালিস শোভাযাত্রায় যোগ দিল, কোনো খেলার মাঠ কিন্তু চোখে পড়ল না ওর।

"যে যার জায়গা নিয়ে দাঁড়াও," রাণী ঘোষণা করলেন।

কাঠের বল খেলার জন্য ছাঁটা ঘাসের যেমন মাঠ হওয়া দরকার, জায়গাটা কিন্তু তেমন নয়, এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল। খেলার বল হল গোল হয়ে গুটিয়ে থাকা সজারু আর খেলার লাঠি হল গাঢ় লাল রঙা একরকম পাখি। রোগাটে লম্বা পাখি, লম্বা লম্বা ঠ্যাং আর লম্বা ঘাড়। সৈন্যরা এখানে ওখানে ঝুঁকে হাত আর পা মাটিতে রেখে ধনুকের মত আকার নিয়েছে।

ওই পাখির ঠ্যাং-লাঠি নিয়ে খেলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল অ্যালিসের। যতবারই ও পাখির একটা ঠ্যাং বাগিয়ে ধরে সজারু-বল মারতে চেষ্টা করছিল, ততবারই পাখিটা লম্বা গলা নিচু করে এমন অবাক হয়ে ওকে দেখছিল যে, অ্যালিস না হেসে পারছিল না।

তারপর যখন ও পাখিটাকে সামলে তৈরী হচ্ছিল সজারু বলটা আবার গড়িয়ে চলে যাচ্ছিল অন্য দিকে। সৈন্যরাও অমন ভাবে ধনুকের মত বেঁকে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তারাও সোজা হয়ে যে যার খুশিমত চলে গেল। শেষ পর্যন্ত সজারু-বলও রইল না, আর বল গলিয়ে দেবার জন্য ধনুকের মত খিলানও রইল না। তাছাড়া খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিল যে, রাণী ক্ষেপে গিয়ে একবার "এর গর্দান নাও", আরেকবার "ওর গর্দান নাও", এই বলে চেঁচিয়েই সার।

অ্যালিস ভাবল শেষ পর্যন্ত কারও হয়তো গর্দান থাকবে না, ওখান থেকে সরে পড়াই ভাল। ঠিক তখুনি শূন্যে একটা আশ্চর্য জিনিস নজরে পড়ল ওর। দু-এক মুহূর্ত পরেই ও বুঝতে পারল ওটা হল দাঁত বার করা একটা হাসি। "নিশ্চয়ই দাঁত বার করা বেড়ালটা", ও ভাবল মনে মনে। পরমুহূর্তে ওটার মাথাটা দেখা গেল, আর কিছু নয়। "রাণীকে কেমন লাগছে ?" বেড়ালটা নিচু গলায় শুধোলো। অ্যালিস বলতে যাচ্ছিল, "বিচ্ছিরি।" তারপরই ওর খেয়াল হল রাণী ওর পাশেই দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন। তাই ও জবাব দিল। "রাণী খুব ভাল খেলেন।"

মালিরা সাদা গোলাপ রঙ করছে

এ কথা শুনে রাণী খুশী মনে অন্যদিকে চলে গেলেন।

"কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি ?" অ্যালিসের পাশে এসে বেড়ালটার মাথা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

"ও আমার বন্ধু"। অ্যালিস জবাব দিল, "দাঁত বার করা বেড়াল।"

"ওকে মোটেই আমার ভাল লাগছে না" রাজা বললেন, আর বেড়ালটা তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল।

রাজা রাণীকে ডেকে বললেন, "এই বেড়ালটাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও।"

সব ব্যাপারেই রাণীর শুধু একটাই সমাধান ছিল। "ওর মাথা কেটে ফেল", কোনদিকে না তাকিয়েই হুকুম করলেন তিনি।

"আমি নিজে জল্লাদকে ডেকে নিয়ে আসছি," এ কথা বলে রাজা তাড়াতাড়ি খুঁজতে বেরুলেন তাকে।

বেড়ালটাকে ঘিরে একটা ভিড় জমে উঠেছে. ওটা কিন্তু দাঁত বার করে হেসেই চলেছে।

এদিকে একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে জল্লাদ বলছে, "মাথা যে কাটব, শরীর কোথায় ? গলা ছাড়া মাথা কাটা যায় নাকি !"

রাজা বললেন, "বোকার মত কথা বল না মাথা থাকলেই মাথা কাটা যায়।"

রাণী বলে উঠলেন, "তাড়াতাড়ি কিছু না করলে, আমি কিন্তু সবার গর্দান নেব, কাউকে বাদ দেব না।"

তারপরই বেড়ালটার মাথা অদৃশ্য হতে শুরু করল, ক্রমে হাসিটাও। ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা মিটে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

৮

রাজ দরবার

দূর থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এল, "এবার বিচার শুরু হবে সবাই রাজ দরবারে এসো।"

অ্যালিস কখনও রাজ দরবারে বিচার দেখেনি, ও দৌড়ুলো শব্দ লক্ষ্য করে।

রাজ দরবারে পৌছে অ্যালিস দেখল রাজা আর রাণী সিংহাসনে বসে আছেন। দরবারে তিলার্ধ জায়গা নেই, ছোট ছোট পাখি, জন্তু আর তাস-মানুষে ভরে গেছে।

গোলামের হাতে-পায়ে বেড়ি, দু' পাশে দু'জন প্রহরী। রাজার কাছেই সেই সাদা খরগোশটা, তার এক হাতে ভেঁপু, অন্য হাতে গোটানো কাগজ। দরবারের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর মস্ত রেকাবিতে আচার চোখে পড়তেই অ্যালিসের খিদে পেয়ে গেল।

বিচারক কিন্তু রাজা নিজেই, মুকুটের ওপর একটা পরচুল চাপিয়েছেন। অ্যালিসের মনে হল রাজার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

বারোজন জুরি আসন নিয়ে বসেছে, তাদের মধ্যে পাখি, টিকটিকি, গিরগিটি এসবও আছে। জুরিরা মনোযোগ দিয়ে শ্লেটে কি যেন লিখছিল।

"বিচারই শুরু হয়নি, কি লিখছে ওরা ?" অ্যালিস একজনকে জিজ্ঞেস করল।

"ওরা নিজেদের নাম লিখছে", ফিস ফিস করে জবাব দিল সেই লোকটি "যাতে বিচার শেষ হবার আগে না ভুলে যায়।"

"কি বোকা !" অ্যালিস হেসে উঠল, "নিজের নাম কেউ ভুলে যায় !"

তখুনি সাদা খরগোশ বলে উঠল, "দরবারে কেউ

কথা বলবে না, চুপ।" ও তিনবার ভেঁপুটা বাজালো, তারপর মোড়ানো কাগজটা খুলে জোরে জোরে পড়ল ঃ

"লেবুর আচার বানিয়েছিলেন
হরতনের রাণী,
গোলাম এসে করল চুরি
সাহস কতখানি !
এবার হবে বিচার তার
দিনটা আজ শনিবার ”

"প্রথম সাক্ষীকে ডাকা হোক", রাজা আদেশ দিলেন। সাদা খরগোশ তিনবার ভেঁপু বাজিয়ে হাঁক দিল, "প্রথম সাক্ষী।"

প্রথম সাক্ষীকে দেখে অ্যালিস অবাক। সে আর কেউ নয়, সেই টুপিওলা। তার এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে মাখন মাখানো রুটি।

"আমি গরীব মানুষ রাজামশাই", টুপিওলা বিনয় করে বলল, "আমার চা খাওয়া শেষ না হতেই তলব করা হয়েছে আমাকে।"

"তুমি চা খাওয়া কখন শুরু করেছিলে?" রাজা প্রশ্ন করলেন।

টুপিও'লার পেছন পেছন চৈত্ খরগোশ কাঠ-বেড়ালের হাত ধরে রাজসভায় ঢুকেছিল। তার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে টুপিওলা জবাব দিল, "যদ্দূর মনে হয় চৈত্র মাসের চোদ্দ তারিখ সকালে।"

"পনের", চৈত্ খরগোশ বলে উঠল। "না, ষোল", বলল কাঠবেড়াল। লিখে নাও জুরিদের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, আর তারাও ব্যস্ত ভাবে লিখতে শুরু করল।

"টুপিটা খুলে রাখ", রাজা বললেন।

"আজ্ঞে, এটা আমার নয়", টুপিওলা জবাব দিল।

"চুরি করেছ?" রাজা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, তারপর তাকালেন জুরিদের দিকে তারা তাড়াতাড়ি লিখে নিল।

রাণী এবার চশমা খুলে এমন কটমট করে টুপিওলার দিকে তাকালেন যে, বেচারীর মুখ শুকিয়ে আমসি।

"ঠিকমত জবাব দাও", রাজা বললেন, "নইলে এখানেই তোমাকে কোতল করা হবে।"

টুপিওলা ঘাবড়ে গিয়ে রুটির বদলে চায়ের পেয়ালায় এক কামড় দিয়ে বসল।

ঠিক তখুনি অ্যালিস বুঝতে পারল ও আবার বাড়তে শুরু করেছে

"আমি গরীব মানুষ রাজামশাই", টুপিওলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আমি মাত্তর সাত কি দশদিন আগে চা খেতে শুরু করেছি, রুটি-মাখন ক্রমেই পাত্‌লা হয়ে আসছিল আর চায়ের ঝিকমিক—"

"কিসের ঝিকমিক?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

সাক্ষ্য দিচ্ছে টুপিওয়ালা

"মানে আমি চায়ের কথা বলছিলাম", আমতা আমতা করে বলল টুপিওলা।

"তুমি যেতে পার", রাজা রেগে বললেন, যত সব ইয়ে......"

টুপিওলা আর ওখানে থাকে! সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগালো।

"বাইরে যাওয়া মাত্র মাথাটা কেটে ফেল।" রাণী একজন রাজকর্মচারীকে লক্ষ্য করে বললেন। কিন্তু টুপিওলা তার আগেই পালিয়েছে।

"পরের সাক্ষীকে ডাকা হোক", রাজা হুকুম দিলেন।

এবার সাক্ষী দিতে এল জমিদার গিন্নির রাঁধুনী। তার হাতে একটা বড় পাত্রে গোলমরিচের গুঁড়ো। সবাই হাঁচতে শুরু করে দিল।

সাদা খরগোশ নিচু গলায় বলল, "রাজামশাই, সাক্ষীকে জেরা করুন।"

রাজা ভুরুটা কুঁচকে নিলেন, তারপর রাঁধুনীকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "আচার কি দিয়ে তৈরী হয়?"

"গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে", রাঁধুনী জবাব দিল।

"উঁহু, গুড় দিয়ে", পেছন থেকে ঘুমজড়ানো গলায় কেউ বলল।

"কাঠবেড়ালটাকে দরবার থেকে দূর করে দাও", রাণী খনখনে গলায় বলে উঠলেন, "ওকে চিমটি কাটো, তারপর মাথাটা কেটে ফেল।"

দরবারে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। কাঠবেড়ালকে বিদায় করে আবার যখন শান্তি ফিরিয়ে আনা হল, তখন দেখা গেল রাঁধুনী সরে পড়েছে।

"পরের সাক্ষী কে হবে কে জানে।" অ্যালিস মনে মনে ভাবল, "এতক্ষণ পর্যন্ত বিচার একটুও এগোয়নি।"

সাদা খরগোশ সরু চেরা গলায় বলল, "এবার সাক্ষী দেবে অ্যালিস।"

৯
অ্যালিসের সাক্ষ্য

অ্যালিস এতই চমকে গিয়েছিল যে, লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি এখানে।"

এদিকে গত কয়েক মিনিটে অ্যালিস মাথায় চড়্ চড়্ করে বেড়ে গেছে। তাই ও যখন লাফিয়ে উঠেছিল, ওর পায়ের ধাক্কায় জুরিরা সব ছিটকে পড়ল।

"ওহো, আমি দুঃখিত," অ্যালিস ক্ষমা চাইল, তারপর জুরিদের ঠিকমত জায়গায় বসিয়ে দিল।

"জুরিদের নিজের নিজের জায়গায় বসাতে হবে—সবাইকে," অ্যালিসের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজা বললেন।

অ্যালিস লক্ষ্য করে দেখল তাড়াহুড়োয় বিল্, অর্থাৎ সেই টিকটিকিটাকে ও চিৎ করে রেখেছে। ও তাড়াতাড়ি ওটাকে উপুড় করে দিল।

"এই চুরির ব্যাপারে তুমি কি জান?" রাজা প্রশ্ন করলেন ওকে।

"কিছুই না," অ্যালিস জবাব দিল।

"সেটাই খুব দরকারি," রাজা জুরিদের লক্ষ্য করে বললেন। তারা শ্লেটে কথাটা লিখতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাদা খরগোশটা বাধা দিয়ে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, "আসলে মহামান্য রাজামশাই বলতে চাইছেন 'অদরকারি।' অ্যালিস লক্ষ্য করল কথাটা বলার সময় খরগোশটা রাজাকে ভেংচি কাটল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অদরকারি," রাজা তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলেন। জুরিদের কয়েকজন লিখল 'দরকারি,' আবার কেউ কেউ লিখল 'অদরকারি।' অ্যালিস ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। ও সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে দাঁড়িয়েই জুরিদের মাথার ওপর দিয়ে শ্লেটে ওরা কি লিখছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

রাজা খুব ভেবে চিন্তে নিজের বইয়ে কি যেন

লিখলেন, তারপর বললেন, "আইনের বেয়াল্লিশের ধারায় লেখা আছে, এক মাইলের বেশী লম্বা মানুষরা রাজসভা ছেড়ে যাবে।"

"আমি এক মাইল লম্বা নই," অ্যালিস প্রতিবাদ করল।

"হ্যাঁ, লম্বা," রাজা বললেন।

"প্রায় দু'মাইল," রাণী যোগ করলেন।

"বেশ, কিন্তু আমি যাব না," অ্যালিস পা দাপালো। "এটা তোমাদের পাকাপোক্ত নিয়ম নয়, এখুনি বানানো হয়েছে।"

"আইনের বইয়ে এটাই সবচেয়ে পুরনো নিয়ম," রাজা বললেন।

"তবে ওটা আইনের এক নম্বর নিয়ম হওয়া উচিত ছিল," অ্যালিসও দমবার পাত্রী নয়।

রাজার মুখটা পাঁশুটে হয়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে জুরিদের দিকে ফিরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "তোমাদের মতামত জানাও।"

"এখনও পর্যন্ত কোনো কিছু প্রমাণ হয়নি," অ্যালিস জোর গলায় বলল।

"আগে শাস্তি, পরে প্রমাণ," রাণী বলে উঠলেন।

"বোকার মত কথা," অ্যালিস উঁচু গলায় বলল, "প্রমাণের আগে শাস্তি দেয়া যায় না।"

"তুমি চুপ কর," রাণী রাগে লাল।

"না, কক্ষণো চুপ করব না," অ্যালিস সমান তালে জবাব দিল। "ওর মাথা কেটে ফ্যাল," রাণী চেঁচিয়ে উঠলেন, কিন্তু কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

"কে তোমাকে ডরায়?" অ্যালিস এতক্ষণে ওর আসল চেহারায় ফিরে এসেছে। "তোমরাতো শুধু খেলার তাস।"

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সব তাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর ঝুর্ ঝুর্ করে ঝরে পড়তে লাগল ওর সারা গায়ে। অ্যালিস খানিক ভয়ে খানিক রাগে চেঁচিয়ে উঠল, তাসগুলোকে ও দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপরই ও দেখল নদীর ধারে দিদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ওর দিদি গাছ থেকে ঝরে পড়া কয়েকটা শুকনো পাতা ওর মুখ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।

"ওঠ্ অ্যালিস," দিদি বলল, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস।"

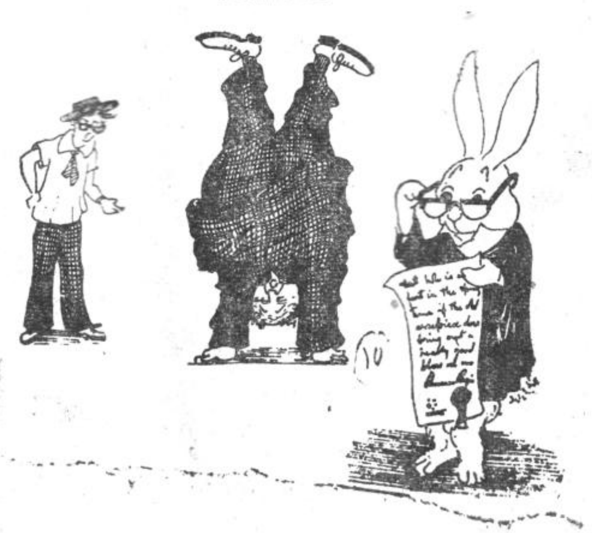

আরবদেশের রাক্ষস

রুমা চক্রবর্তী

আরবদেশের এক সম্রাট ছিলেন। তাঁর নাম শাহরিয়ার। তাঁর সাম্রাজ্যে ধনদৌলত ও প্রজাদের সুখ-শান্তির তুলনা ছিল না। তাঁর শাসনে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ছিল অব্যাহত। সম্রাটের জয়-জয়কার করতো প্রজারা; তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে-বিদেশে।

তাঁর ছোটো ভাই শাহ্‌জামান ছিলেন সমরখন্দের সুলতান। দুই ভাইয়ে খুব ভাব ছিল। দাদার ডাক পেয়ে এলেন, কিন্তু তিনি সব সময় মন-মরা হয়ে থাকেন, মনে তাঁর সুখ-শান্তি নেই, একথা বুঝলেন সম্রাট।

ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এই রকম মনের অবস্থা হওয়ার কারণ কি। কিন্তু ভাই সহজে বলতে চান না। ভাইকে অনেক আদর-সোহাগ করে জানতে চাইলেন ব্যাপার কি। শেষ পর্যন্ত ভাই সব ঘটনা খুলে বললেন। বললেন—

দাদার ডাক পেয়ে তিনি দাদার কাছে আসবার জন্যে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু পথে আসবার সময়ে মনে পড়লো, দাদার জন্যে সবচেয়ে যে প্রিয় বস্তুটি উপহার হিসাবে আনবেন ঠিক করেছিলেন —একটি অমূল্য হীরে, যার মতো হীরে দুনিয়ায় নেই বললেও চলে—সেটি তিনি আনতে ভুলে গেছেন। তাই তিনি কাউকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরলেন রাজধানীতে। গোপন পথে প্রবেশ করলেন রাজপুরীতে। তারপর সকলের অজ্ঞাতে চুপিচুপি এসে ঢুকলেন তাঁর খাস বেগমের মহলে। এসে দেখলেন তাঁর খাস বেগম, একটা নিগ্রো ক্রীতদাসকে নিয়ে গল্প করছেন। ক্রীতদাসের সঙ্গে গল্প!

সমস্ত শরীরে রক্ত টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো। তিনি খাপ থেকে তলোয়ার বার ক'রে এক কোপে তাঁর খাস বেগম ও নিগ্রোটার মাথা কেটে ফেললেন। তারপর হীরে নিয়ে তিনি যেমন গোপনে গিয়েছিলেন, তেমনি গোপনে বার হয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে।

এর পর থেকেই এই দুনিয়ার কিছুতে আর তাঁর আনন্দ নেই, তাই জীবনে তাঁর সুখের দিনও শেষ হয়ে গেছে!

বড় ভাই ছোট ভাইকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বোঝালেন, ছোট ভাই বললেন।

তুমিও যে তোমার খাস বেগমকে এতো বিশ্বাস করো, সেও কি ক্রীতদাসদের সঙ্গে গল্প করে না, তুমি শিকারে চলে গেলে? তুমি তা স্বচক্ষে দেখতে পারো পরীক্ষা করে।

সম্রাট শাহরিয়ার ছোট ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু ভাবলেন, যাচাই ক'রে দেখতে দোষ কি? তিনি ঘোষণা ক'রে দিলেন, আবার শিকারে যাবেন।

সম্রাট শিকারে যাবেন। আবার রাজপুরীতে হৈ-রৈ শুরু হলো। একদিন শিকারে রওনা হয়ে গেলেন। তারপর রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে তিনি চুপিচুপি ফিরে এলেন রাজপুরীতে। এসে যা দেখলেন, তা কল্পনাও করেন নি! তাঁর হারেমে তাঁর বেগমরা নিগ্রো ক্রীতদাস নিয়ে গল্প করছে। তাদের মধ্যে

তাঁর প্রিয়তমা খাস বেগমও আছে।

সম্রাট শাহরিয়ারকে তাঁর ভাই বললেন, দেখলে তো সংসারের অবস্থা। চলো, আমরা সংসার ছেড়ে কিছুদিনের জন্য চলে যাই।

সম্রাট শাহরিয়ার ও তাঁর ভাই গোপনে ফকিরের বেশে সংসার ছেড়ে রাজপুরী থেকে বেরুলেন। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন রাজপুরী থেকে অনেক দূরে। লোকালয় ছেড়ে পার হয়ে চললেন বড় বড় নির্জন মাঠ। শেষে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় একটা গাছের তলায় এসে বসলেন।

তাঁরা গাছতলায় একটুখানি বিশ্রাম করবেন বলে ভেবেছিলেন, কিন্তু তা আর হ'লো না। দেখলেন, একটা বিরাটকায় ভয়ংকর দৈত্য একটা মস্ত কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে ঐ গাছের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁরা আর দেরি না ক'রে প্রাণভয়ে গাছের উপরে উঠে বসলেন। দৈত্যটা গাছতলায় এসে বাক্স নামিয়ে বসলো। তারপর একটুক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগলো।

ধীরে ধীরে খুলে গেল বাক্সের ডালাটা। বাক্সের ভেতর থেকে বেরুলো এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। দৈত্যটা ওঁদের দেখতে না পেলেও মেয়েটা কিন্তু দেখতে পেলো। মেয়েটা হেসে ওঁদের বললো, ও রাক্ষসটা এখন ঘুমিয়েছে, ভয় নেই, তোমরা নেমে এসো।

ওঁদের খুবই কৌতূহল হ'লো। এমন অপরূপ রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। দৈত্যের হাতে সে কেমন ক'রে পড়লো? তাঁরা দু ভাই গাছ থেকে নেমে এলেন। মেয়েটা বললো, এই ভয়ংকর দৈত্যটা তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে এসে বিয়ে করেছে। কিন্তু তাকে একটুকুও বিশ্বাস করে না। তাই তাকে এই বাক্সে ভরে সর্বদা মাথায় নিয়ে ঘোরে। কিন্তু তাতে কি হবে? ও যখন ঘুমোয়, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়। সেই সুযোগ ওর চোখে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সম্রাট শাহরিয়ার বললেন, সংসার ছেড়ে গিয়েই বা লাভ কি? সংসারে থেকেই এদের শায়েস্তা করা দরকার,—দরকার এদের উচিত শাস্তি দেওয়া।

সম্রাট শাহরিয়ার আবার তাঁর রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি প্রাসাদে গিয়ে তাঁর সব বেগম ও বাঁদীদের হত্যা করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন তিনি রোজ একটি ক'রে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করবেন। রাতের মত তাঁর বেগম। তারপর রাত্রি-শেষে তাকে হত্যা করা হবে!

সম্রাট তাঁর উজির বা প্রধানমন্ত্রীকে হুকুম দিলেন। নিয়ম মতো প্রতি সন্ধ্যায় সম্রাট বিয়ে করলেন, মেয়েটি বেগম হয়ে চোখের জলে রাত কাটালো, তারপর সকালে তাকে হত্যা করা হ'লো

প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ সম্রাট শাহরিয়ার পরিণত হলেন একটি দানবে। বহু কুমারী মেয়ে এইভাবে প্রাণ হারালো। অনেক বাপ-মা তাদের কুমারী মেয়েদের নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালালো। শেষ পর্যন্ত সম্রাটের প্রতিদিনের বেগম যোগানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। উজির এসে সেকথা জানালেন সম্রাটকে। সম্রাট কিন্তু রেগে বললেন, না পারলে উজিরের মাথা যাবে। উজির প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে বেগম যোগাড় ক'রে মেয়ে যোগাড় করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন সত্যিই প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও কুমারী মেয়ে সংগ্রহ করা গেল না।

তিনি ক্লান্তদেহে বিষণ্ণ বিমর্ষ হয়ে বাড়িতে এসে শুয়ে পড়লেন। বড় মেয়ে শাহরাজাদ বাবার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবার কি হয়েছে। উজির বললেন, আজ আর রাজ্যময় খোঁজ ক'রেও সম্রাটের জন্যে কোনও কুমারী মেয়ের সন্ধান মেলেনি। তাই আজ তাঁর প্রাণ যাবে।

উজিরের বড় মেয়ে শাহরাজাদ ছিলেন যেমন রূপসী, তেমনি বিদূষী ও বুদ্ধিমতী। তিনি বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তাতে ভয় কি বাবা! আমিই আজ সেই রাক্ষসের হারেমে বেগম হয়ে যাব। মেয়ের কথা শুনে উজির কাঁদতে লাগলেন।

শাহরাজাদ বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাবা, আমাকে তুমি নির্ভয়ে পাঠিয়ে দাও। সম্রাটের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রো।

সেদিন সন্ধ্যায় উজির চোখের জলে তাঁর মেয়ে শাহরাজাদের সঙ্গে সম্রাট শাহরিয়ায়ের বিয়ে দিলেন। শাহরাজাদের রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন সম্রাট। শাহরাজাদার ছলছল চোখ দেখে সম্রাট বললেন, তোমার চোখে জল কেন?

শাহরাজাদ মিষ্টি ক'রে বললেন, অন্য কোনো কারণে নয়। একরাতের জন্যে হ'লেও সম্রাটের বেগম হ'তে পাওয়া অনেক পুণ্যের ফল। আমার আজ আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার একটি ছোট বোন আছে, সে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তার কথা ভেবে ব'ড়ো কষ্ট হচ্ছে।

এতোদিন সম্রাট জোর ক'রে যেসব মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তাদের চেয়ে এই মেয়েটি যেন আলাদা। তারা মরবার ভয়েই আধমরা হয়ে থাকতো। কিন্তু এর যেন মরবার ভয়ই নেই। কয়েক ঘন্টা বাদে মরবে জেনেও এ কেমন স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছে! সম্রাট শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, তোমার বোনকে আনিয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে ছুনিয়াজাদকে হারেমে আনা হ'লো। ফুলের কুঁড়ির মতো তার রূপ। তাকে ভালোই লাগলো সম্রাট শাহরিয়ারের: রাত যখন গভীর হলো, তখন সে দিদিকে বললো, দিদি, আমার যে ঘুম আসছে না। রোজকার মতো তুই আমাকে গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দে।

শাহরাজাদ বললো, তা কি হয় রে সোনা! আমি যে সম্রাটের বাঁদী। তাঁর হুকুম ছাড়া কি আমি তোকে গল্প শোনাতে পারি?

সম্রাট শাহরিয়ার বললেন, আচ্ছা, শোনাও না তোমার গল্প। আমিও শুনি।

শাহরাজাদ শুরু করলেন তাঁর গল্প। ভোর হওয়ার আগে তিনি তাঁর গল্প অসমাপ্ত রেখে বন্ধ করলেন। এমনই গল্প যে তার শেষ না জেনে থাকা যায় না। গল্প শোনার নেশা সম্রাট শাহরিয়ারকেও পেয়ে বসে। রাত্রি শেষ হয়, কিন্তু গল্প শেষ হয় না, শাহরাজাদকে হত্যা করার কথা সম্রাট ভুলেই যান। শাহরাজাদের রূপে গুণে ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন সম্রাট। এমনি ক'রে হাজার এক রাত্রি—মানে প্রায় তিন বছর—গল্প শোনান শাহরাজাদ। মাঝে দুবার তাঁর শরীর খারাপ থাকায় কয়েকদিন গল্প বলা বন্ধ থাকে। গল্প শুনতে শুনতে সম্রাট শাহরিয়ার শাহরাজাদকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেন। কোনো স্ত্রীলোকের যে এত জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি থাকতে পারে, এর আগে সম্রাট শাহরিয়ায় তা ভাবতেও পারেন নি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁর যে কুৎসিত ধারণা ছিল, তাও দূর হয়ে গেছে। আগের মতোই তাঁর মনে আবার দয়ামায়া, স্নেহ, মমতা ফিরে এসেছে। তিনি যেন আবার নূতন মানুষ হয়ে উঠেছেন।

এই নূতন জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন শাহরাজাদার। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কেবল গল্পই শোনাওনি। অনেক শিক্ষা, অনেক জ্ঞান, আমি তোমার কাছে পেয়েছি। এক নূতন সুন্দর জগৎ ভেসে উঠেছে আমার চোখের সামনে। সত্যি, আমার মন আজ নির্মল পবিত্র হয়ে উঠেছে। ছোটভাইয়েরও মনে শান্তির পবিত্র দীপ জ্বেলে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে দিলেন ছুনিয়াজাদের বিয়ে।

তিনজনে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দক্ষিণ পশ্চিম দিক ধরে উঁচু জমির দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। এখানে কোনও দিন কোনও মানুষ এসেছিল বলে মনে হল না। লেগ্রাণ্ড এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দেখে নিশানা ঠিক করে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতঃস্ততঃ কোনও ভাব নেই। যেন পথ তার চেনা।

গুপ্তধন রহস্য

সূর্য পাটে বসেছে। দুঘণ্টা হাঁটার পর উঁচু জমিটার মাথায় পৌঁছলাম! চূড়াটা প্রায় সমতল, ঘন বন জঙ্গলে ঢাকা। সামনে একটা লম্বা টিউলিপ গাছ. অনেক দূর সোজা উঠে ছাতার মত ডালপালা মেলেছে। আশে পাশে কয়েকটা বেঁটে বেঁটে ওক গাছ। জুপিটার তার লম্বা কাস্তে দিয়ে ঝোপ ঝাড় ছেঁটে দিয়ে আমাদের যাবার পথ তৈরি করে দিচ্ছিল।

লেগ্রাণ্ড টিউলিপ গাছটার কাছে পৌঁছে ওপর দিকে চেয়ে দেখে। জুপিটারকে জিজ্ঞেস করে—জুপি. এই গাছটায় উঠতে পারবে।

জুপিটার মাথা চুলকোতে চুলকোতে গাছের গুঁড়ির চারপাশ ঘুরে এল—হ্যাঁ সার! এগাছ কেন, যে কোন গাছেই আমি উঠতে পারবো!

—বেশ তা'হলে দেরী করে লাভ নেই। গাছে উঠতে আরম্ভ কর। এখনই অন্ধকার হয়ে যাবে, যা দেখতে চাই আমি অন্ধকারে তা হয়তো দেখাই যাবে না। আর এই স্ক্যারাবটা সঙ্গে নাও!

—ওই শয়তান পোকাটা সঙ্গে নিতে হবে?

—ভয়কি? একটা মরা পোকা, ওটাকে তো হাত দিয়ে ধরবে না, ধরবে এই দড়িটা দিয়ে। পোকাটা যদি না নিয়ে যাও. এই বেলচা দিয়ে তোমার মাথা ফাটাব!

—না, না, দড়ি ধরে ওটা নিয়ে যাবো। তা' কত-দূর উঠতে হবে মালিক।

টিউলিপ গাছ বড় হলে তার কাণ্ডের ছালগুলো ফেটে ফেটে যায়। ছোট ছোট ডালও গজায়। কাজেই সেগুলোতে পা রেখে, জুপিটারের পক্ষে গাছে চড়তে খুব অসুবিধা হল না।

প্রায় ষাট সত্তর ফুট উঠে একটা বড় মোটা ডালে পা ঝুলিয়ে বসে জুপিটার বলে, একটা মোটা ডালের ওপর বসে আছি। এবার কি করব মিস্টার উইল?

—এই ধারের সবচেয়ে বড় ডালটা দেখ! আরও ওপরে উঠে যাও!

জুপিটার গাছের ডাল বেয়ে আরও ওপরে উঠতে

লাগল। খানিক বাদে গাছের ঘন পাতা ভেদ করে তার চেহারাটা আর দেখা গেল না। ওপর থেকে অশরীরী কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আর কতদূর উঠবো মিস্টার উইল?

—কদ্দূর উঠেছো?

—ওপরে চাইলে আকাশ দেখতে পাচ্ছি।

—আকাশ দেখতে হবে না, নীচের দিকে চেয়ে দেখ। এই পাশের কটা ডাল দেখতে পাচ্ছ?

জুপিটার গুণছে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,.... এই দিকে পাঁচটা বড় বড় ডাল আছে!

আরও একটা ডাল ওপরে উঠে যাও।

খানিকবাদে জুপিটারের গলার স্বর ভেসে এল—সপ্তম শাখায় পৌঁছে গেছে সে।

লেগ্রাণ্ডের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল—ওই মোটা ডালটা বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাও জুপি যতটা পার। আশ্চর্য হবার মতন কিছু দেখলে আমাকে জানাও!

আমার উদ্বেগ বাড়ছে—সত্যিই লেগ্রাণ্ডের মাথা খারাপ হয়েছে। এই উন্মাদটাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব কি করে, সেই চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

জুপিটারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—মোটা ডালটার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেচি!

লেগ্রাণ্ড পাগলের মতন চেঁচিয়ে ওঠে, আরও এগিয়ে যাও জুপি, একেবারে ডালের আগার দিকে—

—হ্যাঁ যাচ্ছি—আঃ আঃ গাছের ডালে ওটা কি? লেগ্রাণ্ডের গলার স্বরে খুশী উপচে পড়ছে—চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি দেখছ।

জুপিটারের গলার স্বরে এখন আর আতঙ্ক নেই। —না না এমন কিছু নয়! কে যেন তার মুণ্ডুটা এখানে রেখে গিয়েছিল। কাক, শকুনে সব মাংস খুবলে খেয়ে নিয়েছে। পড়ে আছে শুধু মুণ্ডুর

কঙ্কালটা।

—একটা নরমুণ্ড দেখছ। ডালের সঙ্গে কিভাবে আটকানো আছে ?

—দাঁড়ান, দেখি ভালো করে! আরে তাজ্জব কুৎ কে যেন একটা গজাল পুঁতে মুণ্ডটা ডালের সঙ্গে আটকে রেখেছে।

—জুপিটার যা বলছি এবার মন দিয়ে শোন! মুণ্ডুটার বাঁ চোখ কোনটা ঠিক করে নাও।- বাঁ চোখ বুঝলে ? তোমার কোনটা ডান হাত, কোনটা বাঁ হাত নিশ্চয় জানো!

—হ্যাঁ, আমি তো বাঁ হাত দিয়ে কাঠ কাটি!

—ঠিক, ঠিক, তুমি ন্যাটা। তোমার বাঁ হাত, যে হাত দিয়ে কাঠ কাটো, সেই দিকেই আছে তোমার বাঁ চোখ। বুঝেছ ?—এইবার মুণ্ডুটার বাঁ চোখ কোনটা দেখে ঠিক করো!

খানিকক্ষণ কোনও সাড়া শব্দ নেই। তারপর—মুণ্ডটার বাঁ হাত যে দিকে সেই দিকেই তো বাঁ চোক হবে ? —মুণ্ডটার তো কোন হাত নেই—বাঁ হাত কোনটা ?—যাক্‌গে, হাত না থাক। এইটেই তাহলে মুণ্ডটার বাঁ চোখ। এখন কি করবো ?

দড়ি বাঁধা পোকাটা বাঁ চোখের কোটরের ভেতর দিয়ে গলিয়ে নীচে নামিয়ে দাও। তবে যতক্ষণ না বলছি দড়ি ছেড়ো না।

—ঠিক আছে। মিস্টার উইল। চোখের কোটরের ভেতর দিয়ে পোকাটা গলিয়ে দেওয়া খুব সহজ। এই পোকাটা নামিয়ে দিলাম

জুপিটারের কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতো বাঁধা পোকাটা দেখা গেল। পড়ন্ত রোদে ওর ডানা দুটো ঝকঝক করছে।

সুতোর প্রান্তে পোকাটা ঈষৎ দুলছিল। দোলন বন্ধ হ'তে লেগ্রাণ্ড বলে উঠলো ঠিক আছে জুপি এইবার সুতোটা ছেড়ে দাও! পোকাটা নীচে পড়ল।

পোকাটা সোজা মাটিতে এসে পড়ল। লেগ্রাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যে জায়গায় পোকাটা পড়েছিল, সেইখানে একটা খুঁটো পুঁতে দিয়ে বললে, —কাজ শেষ জুপি। তুমি এবার নীচে নেমে এস! জুপি গাছ বেয়ে নেমে আসছে। লেগ্রাণ্ড পকেট থেকে একটা টেপ (মাপবার ফিতে) বের করলো। খুঁটিটার কাছের গাছের গুঁড়িতে টেপের এক প্রান্ত আটকে দিয়ে খুঁটিটার গা ঘেঁষে আরো পঞ্চাশ ফুট দূরে ফিতেটা নিয়ে গেল তারপর সেখানে আর একটা খুঁটি পুঁতল! এবার দ্বিতীয় খুঁটিটা কেন্দ্র করে আর ফিতেটা বাহু করে চার ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত আঁকল খুঁটিটা ঘিরে। এরপর লেগ্রাণ্ড নিজে একটা বেলচা তুলে নিয়ে অপর দুটো বেলচা আমাদের দিয়ে বললে, দেরী করো না। অন্ধকার হয়ে আসছে। এই বৃত্তের মধ্যে খুঁড়তে আরম্ভ করো?

লেগ্রাণ্ডের প্রস্তাবে খুশী হতে পারলুমনা। অন্ধকার হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ধরে চড়াইয়ের পথে উঠে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভেবে দেখলাম এ সময় যদি না বলি, সাহায্যের জন্যে হাত লাগাতে না চাই, লেগ্রাণ্ডের মানসিক ভারসাম্য হারাবার আশঙ্কা আছে।

আমার ধারণা হল, অসুস্থ লেগ্রাণ্ড, মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন সম্পর্কে এই অঞ্চলের কোনও কিম্বদন্তিতে বিশ্বাস করেছে। অথবা জুপিটারের ভাষ্য 'খাঁটি সোনার তৈরী পোকা' কথাটা সে বিশ্বাস করেছে। মাথার গোলমাল হলে এধরনের কথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়! 'ওই সোনা পোকাই তাকে কুবেরের ঐশ্বর্যের সন্ধান দেবে'—লেগ্রাণ্ডের কথা গুলো মনে হল আবার। দুর্ভাবনায় মনটা ভারাক্রান্ত। তবু যত তাড়াতাড়ি এই গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারটা চুকে যায়, ততই মঙ্গল।

কাজেই একটা বেলচা হাতে তুলে নিলাম। লেগ্রাণ্ড বুঝুক সে অলীক স্বপ্ন দেখেছে, মরীচিকার পিছনে ছুটছে।

লণ্ঠনগুলো জ্বালা হয়েছে। খোঁড়বার সেই বৃত্তাকার জায়গায়টায় যাতে ভালো ভাবে আলো পড়ে সেই ভাবে আলোগুলো-কে সাজিয়ে রেখে, তিন জনে তিন দিক থেকে গর্ত খুড়তে আরম্ভ করলাম। প্রায় দুঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ির পর প্রায় পাঁচ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলেছি—কোথায় গুপ্তধন? একটা তামার পয়সারও হদিশ মিলল না। দেখলাম লেগ্রাণ্ড খুব নিরাশ হয়ে পড়েছে। বললে, বৃত্তটা আরও বড় করে খুঁড়ে দেখা যাক।

কিছুই পাওয়া গেল না। লেগ্রাণ্ড হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে। সে বাড়ি ফেরার জন্যে পা বাড়ালো। আমি তার পিছু নিলাম। জুপিটার কাস্তে, খন্তা, বেলচা গুলো তুলে নিল! সব শেষে আসছে লেগ্রাণ্ডের কুকুর উলফ। দশ বারো পা এগিয়েছি। হঠাৎ লেগ্রাণ্ড থমকে দাঁড়ালো। জুপিটারের দিকে তেড়ে এসে তার জামার কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলো এই বুদ্ধু। পাজির পা-ঝাড়া। বল, তোর বাঁ চোখ কোনটা? জুপিটার ভয়ে কাঁপছে। হাত থেকে খন্তা, বেলচা সব পড়ে গেল। কাঁপা গলায় বললে—এইতো মিস্টার উইল, এইটে তো আমার বাঁ চোখ!—এই বলে জুপিটার নিজের ডান চোখ দেখিয়ে দিল।

লেগ্রাণ্ড খুশীতে ডগমগ করছে।—যা ভেবেছি তাই। ব্যাটা বুদ্ধু নিগ্রো! ডানদিক বাঁদিক কোনও জ্ঞান নেই। তাই বলি, ভুল হবার কথা নয়, তবু ভুল হল কেন?—চল, চল অন্ধকার হয়ে এসেছে! তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

আবার সেই টিউলিপ গাছের নীচে প্রথম খুটির কাছে

পেঁাছালাম আমরা। লেগ্রাণ্ড বলে—খুব ভেবে কথা বলবি, নইলে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবো। মুণ্ডটার মুখ কোন দিকে ছিল—বাইরের দিকে না গাছের ভিতর দিকে?

—বাইরের দিকে!

—আচ্ছা। এবার বল কোন চোখের কোটর দিয়ে সুতো বাঁধা পোকাটা ফেলে দিয়েছিলে? ডান চোখে আঙুল দিয়ে জিজ্ঞেস কর—এইটে! না এইটে, বলে বাঁ চোখে আঙুল রাখে!

জুপিটার নিজের ডান চোখে দেখিয়ে বলে, এই চোখ মিস্টার উইল। এইটেই তো বাঁ চোখ!

—যাক ফয়শালা হল। এবার নতুন করে নিশানা ঠিক করতে হবে।

এবার লেগ্রাণ্ডের পাগলামির মধ্যে যুক্তির আভাস পেলাম। আগের খুঁটিটা তুলেনিয়ে সেটা পশ্চিম দিকে প্রায় তিন ইঞ্চি সরিয়ে এনে আবার পুঁতে দিল লেগ্রাণ্ড। তারপর আগের মতনই ফিতে মেপে পঞ্চাশ ফুট দূরে আর একটা খুঁটি পুঁতলো। নতুন খুঁটিকে কেন্দ্র করে বেশ বড়ো একটা বৃত্ত আঁকলো। এই নতুন জায়গাটা আমাদের খুঁড়ে গর্ত করা স্থান থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে।

ক্লান্ত শরীর যেন আর বইছে না। তবু যেন নতুন

উৎসাহ পাচ্ছি। মনে মনে উত্তেজনাও বোধ করছি। গুপ্তধন কি সত্যিই পাওয়া যাবে? তিনজনেই যেন পাগলের মতন গর্ত খুঁড়ে চলেছি। [চলবে]

কমপিউটর, ২০৮১

ডঃ সত্যেন দত্ত

খেলাটা শুরু হয়ে ছিল বিংশ শতাব্দীতে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—অঙ্ক কষার দরকার নেই। ক্যালকুলেটর সব হিসেব বলে দেবে। দেশে কতো ফসল ফলবে, কজন শিশু জন্মাবে, কোথায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়লে ভালো হয়। ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ড জিতবে না ইনডিয়া, ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল না মোহন-বাগান। সব খবর বলে দেবে কমপিউটর। অজস্র তথ্য তার গভীরে জমা থাকে। তারই সাহায্যে যন্ত্র বলে দেয়, কি হতে পারে, কি হওয়া উচিৎ বা সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীতে মাঝে মাঝে পোস্টার দেখা যেত। 'কমপিউটর চালু হলে বেকারের সংখ্যা বাড়বে।' মিছিলে শ্লোগান উঠতো—'কমপিউটর চালু করা চলবেনা, চলবেনা।'

এখন একবিংশ শতাব্দীতে ইলেকট্রনিকের জয়যাত্রা এতোদূর এগিয়েছে যে বিংশ শতাব্দীর বোকা মানুষগুলোর পোস্টার-শ্লোগান নিয়ে এখন হাসির নাটক হয়, মজার কার্টুন ছাপা হয় সায়ন্সি—ম্যাগাজিনে। এক কমপিউটর আর এক কমপিউটর-কে বলছে—'বড্ড খাটুনি! টাইম-মেশিনে বিংশ শতাব্দীর কলকাতা থেকে কিছু লোক নিয়ে এসে মিছিল করা দরকার। তাহলে কিছুদিন বিশ্রাম পাওয়া যেতো।'

....সময়, ২০৮০ খ্রীঃ।

সুতরাং এখন ডাক্তার রোগী দেখেনা। হার্ট কেমন চলছে, পাল্‌সরেট ঠিক আছে কিনা, টেম্পারেচর কত : সব তথ্য যন্ত্র জানে, কমপিউটরকে জানিয়ে দেয়। চিকিৎসা কি হবে : কমপিউটর বলে দেয়। তখন কাটা-ছেঁড়া বা ওষুধ দেওয়ার জন্যে শুধু ডাক্তার নার্সের দরকার।

খেলাধূলো তো প্রায় উঠে যাওয়ার জোগাড়। ইস্টবেঙ্গল জিতবে না মোহনবাগান, আগে ভাগেই জেনে যায় সবাই। খেলার মাঠে ভিড় হয় না।

গোয়েন্দা-গল্প আজকাল কেউ পড়েনা। খানিকটা পড়ে মিনি কমপিউটরে ডাটা ঢুকিয়ে দিলই যন্ত্র জানায়, খুনী কে। শেষ অবধি পড়তে কারো উৎসাহ থাকেনা।

স্কুলে অঙ্ক কষা বন্ধ হয়েছে। ক্যালকুলেটর গুণ-ভাগ বর্গমূল সব করে দিচ্ছে। অঙ্ক কষা ভুলেই গিয়েছে সবাই।

চাকরীর ইনটারভিউ হয় না। কমপিউটার বলে দেয়, চাকরীতে রামকে নিলে ভালো হবে, না শ্যাম আরও ভালো।

বিয়ের পাকাদেখা উঠে গেছে। কমপিউটরে পাত্র পাত্রীর হাইট ওয়েট, আইসক্রীম পছন্দ না পুডিং, ঘুমের সময় নাক ডাকে না ডাকেনা : এসব তথ্য ভরে দিলেই যন্ত্র জানায়, কার সঙ্গে কার বিয়ে হওয়া উচিৎ।

সবার হাতে হাতে মিনি কমপিউটর, কারও পকেটে পকেট কমপিউটর।

তবুও মানুষ মানুষই।

ভারতের কমপিউটার বলেছিল—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ভালো নয়। মানুষ মরবে। খরচা বাড়বে।

তবু যুদ্ধ বাধলো।

পাকিস্তানের ইসলামিক কমপিউটর নাকি বলেছে—কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিৎ।

দোষটা কমপিউটরের নয়।

যেসব ডাটা কমপিউটরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোরই দোষ।

যেমন ...

ঔরঙ্গজীব বলেছেন, পৌত্তলিকদের মুণ্ডু চাই।

আয়াতুল্লা খোমেইনী বলছেন, কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিৎ।

জেনারেল জিয়া বলেছেন, এফ-১৬ যুদ্ধবিমান চাই। ওঁরা সবাই অতীতের মানুষ।

কিন্তু ওঁদের কোটেশনগুলো ডাটা হিসাবে ব্যবহার করায় পাকিস্তানী কমপিউটর বললো—যুদ্ধ চাই।

যুদ্ধ বাধলো।

যুদ্ধ চললো।

কিন্তু যুদ্ধ থামলোনা।

ব্যাপারটা এইরকম....

কমপিউটরের যুগে যুদ্ধ জেতা যায়না।

যেমন···পাকিস্তানের কমপিউটর ঠিক করলো, জয়পুর আর বিকানীরে বোমা ফেলা উচিত, ওখানে ভারতের গ্রাউণ্ড-টু-এয়ার মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র নেই। তার আগেই কিন্তু ভারতের কমপিউটর বলে দিয়েছে, পাকিস্তানী বিমান আক্রমণ হবে জয়পুর কিম্বা বিকানীরে, ওখানে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী রাখো।

যুদ্ধে প্রথমদিকে পাকিস্তান হারছিল। তারপর নতুন ডিকটেটর মহম্মদ বিন তুঘলকের অর্ডারমাফিক ঔরঙ্গজীব, জিন্না, ভুট্টো, জিয়া, খোমেইনির কোটেশন গুলো বাতিল করে অস্ত্রসজ্জা, বিমানবহর, সাবমেরিন ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপারে দুদেশের সব তথ্য পাকিস্তানী কমপিউটরে ভরে দিতেই দেখা গেল, পাকিস্তান আর হারছেনা।

হারছেনা, কিন্তু যুদ্ধ জিতছেওনা।

জিতবে কি করে?

ভারতের সাবমেরিন কোথায় আছে, পাকিস্তানী জাহাজ আগেই জানে। পাকিস্থানের বিমান কোথায় বোমা ফেলবে, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র বিশারদরা অনেক আগেই জেনে গেছেন।

পাঁচশ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে।

কেউ জেতে না, কেউ হারে না। সন্ধিও হয় না।

নতুন ধরনের কমপিউটর আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের অর্ডার দিয়েছিলেন ভারতের সর্বাধিনায়িকা প্রজ্ঞাপারমিতা। বিজ্ঞানীরা বললেন, তা হয় না। কমপিউটর কতোরকমের হতে পারে, অনেক আগেই কমপিটর তা জানিয়ে দিয়েছে। প্রজ্ঞা-পারমিতা গজগজ করলেন, আভ্যন্তরীণ এমার্জেন্সী চালু করে বিজ্ঞানীদের তিহার জেলে পাঠানোর ভয় দেখালেন। শেষ অবধি কিছুই করলেন না। কমপিউটর চালু রাখতে হলে ইলেকট্রনিক—বিশারদ চাই সুতরাং বিজ্ঞানীদের চটানো চলেনা।

যুদ্ধ চলছে। দুপক্ষেরই ক্ষতির অংক বাড়ছে। কিন্তু জিতছেনা, কেউ হারছেনা....

এমনি দিনে....

কলকাতা থেকে প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ওঁর পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রধান উৎকোচকর্পূর দাশ।

প্রজ্ঞাপারমিতার চুল পেকেছে, মুখের হাসিটা সুন্দর

কিন্তু মেজাজটা খাট্টা।

উৎকোচকর্পূরকে দেখে খুশী হয়েছিলেন, কিন্তু ওর পাশে একটা বাচ্চা হাফ-প্যান্ট-পরা ছেলেকে দেখে বললেন—'এ আবার কে ?'

'ঘণ্টাকর্ণ। আমার ছেলে। ও আমাদের সাবেকী বাড়িতে পুরোনো একটা বই দেখে কিভাবে যেন.... আমি ঠিক জানিনা…ঘণ্টা, কাগজ পেনন্সিল বের কর

এতোক্ষণ চুইংগাম চিবুচ্ছিল ঘণ্টা। এখন পকেট থেকে কাগজপেনন্সিল বের করলো।

'লেখ, ৬ আর ৩। এবার বল—'

'যোগ করলে ৯, বিয়োগ করলে ৩, গুণ করলে ১৮, ভাগ করলে ২'—ঘণ্টা বলে গেল।

প্রজ্ঞা হেসে বললেন—

'ক্যালকুলেটর দেখে মুখস্থ করেছে বুঝি ?'

'না, আপনি যে কোন সংখ্যা বলুন—

'লেখো, ৭২ আর ২৯'

কাগজে আঁকিবুঁকি কেটে ঘণ্টা বললো—

যোগ করলে ১০১, বিয়োগ করলে ৪৩, গুণ করলে ২০৮৮, ভাগকরলে ২ দশমিক ৪৮০০০'

প্রজ্ঞা আঁতকে উঠলেন।

ডেস্ক-ক্যালকুলেটরে উনি কয়েকবার বোতাম টিপলেন।

তারপর চোখ বড় বড় করে বললেন—

'ঠিক বলেছ কাগজটা দেখি—'

উল্টেপাল্টে কাগজটা দেখে উনি বললেন—'উৎকোচ. এ তো পেপার কমপিউটর নয়। ব্যাপারটা কি বলো তো ?....কি যেন নাম…ঘণ্টা হ্যাঁ. হ্যাঁ তুমি কি করে জানলে, ৭২ আর ২৯ যোগ করলে ১০১ হবে ?'

'আজ্ঞে, ৯ আর ২ এ হয় ১১'।

'কেন ?'

'এইভাবে হাতের কড় গুণে ৯, ১০, ১১,।'

'তারপর ?'

'১ বসালাম, ১ হাতে রাখলাম।'

'হাতে রাখলাম ? হাতে রাখা মানে ? নাঃ, অসম্ভব ! আমি প্ল্যানিং কমিশনের মীটিং ডাকছি। তোমরা বসো।'

* * প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যেরা এলেন।

খণ্ডগিরি অচলগিরি রাও ইলেকট্রনিক স্পেশ্যালিস্ট। উনি বললেন—

'আর কি জানো ? বর্গ ? বর্গমূল ? বলো, ৯র বর্গমূল কত ?'

'আজ্ঞে, ৩।'

'১০৮৯ র ?'

আজ্ঞে, কষে দেখছি, ।...হ্যাঁ, ৩৩।'

'এ কি ? তুমি ১০র মাথায় আর ৮৯র মাথায় দাগ টানলে কেন ?'

'এইভাবে কষতে হয়।'

পাণ্ডুরং বাজীরাও ঐতিহাসিক উনি বললেন—

'এইভাবে এককালে অঙ্ক কষা হত ভুল হত বলে কমপিউটর হবার পর অঙ্কের বই সব পুড়িয়ে ফেলা হয়।'

গর্জন সিং সামরিক বিশেষজ্ঞ। উনি কিন্তু খুব খুশী হলেন

'তুমি হাসছো কেন গর্জন ?

—প্রজ্ঞা ভুরু কোঁচকালেন।

'মাদাম, যুদ্ধ আমরাই জিতবো। এই ঘণ্টাই আমাদের জেতাবে। প্লেন, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ —এদের গতিপথ কমপিউটর ঠিক করে। পাকিস্তানি কমপিউটর তা বুঝতে পারে। এখন ঘণ্টা ওর মগজে অংক কষে ঠিক করলে ওরা ধরতে পারবেনা।'

'ইউরেকা !'

—প্রজ্ঞা চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপর বললেন—

'কে যেন বলেছিল ?'

'আর্কিমিডিস'

—বাজীরাও বললে.—

তখন কমপিউটর ছিলনা।

তাহলে নতুন একটা প্রোজেক্ট চালু হোক অপারেশন ঘণ্টাকর্ণ। যুদ্ধে আমারা জিততে শুরু করলেই পাকিস্তান সন্ধি করবে। যুদ্ধ থামবে উৎকোচ. তোমাকে দেশিকোত্তম উপাধি আর দশ লাখ টাকা দেওয়া হবে। তোমার ছেলে দিল্লীতে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের অঙ্ক কষা শেখাবে।'

'নিশ্চয়ই, মাদাম',

উৎকোচ খুসী হয়ে বললো।

ঘণ্টার চেহারা দোহারা, মাথাটা শরীরের তুলনায় বড় সেই মাথা দুলিয়ে ও বললো—

'না, আমি শেখাবো না।'

গর্জন সিং বললেন—

'প্লীজ, ঘণ্টা !'

খণ্ডগিরি বললেন—

'ঘণ্টা, তুমি প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান হবে।'

বাজীরাও বললেন—

'ঘণ্টা, তোমার নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে'।

উৎকোচ বললেন—

'ঘণ্টা, মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব !' এবং প্রজ্ঞা বললেন—

'ঘণ্টা, তুমি যা চাও, তাই পাবে।"

'চুইংগাম, চকোলেট, আইসক্রীম, বাবলগাম, প্যাস্টি, সাড়েবত্রিশ ভাজা, ভেলপুরী বাটাটাপুরী— যখন যা চাইবো···

'সব পাবে

'ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলার রেজাল্ট কমপিউটর আগে থেকে বলবেনা।"

'বলবেনা।'

'ক্রিকেটের টেস্টে ইংল্যাণ্ড জিতবে না ইণ্ডিয়া কমপিউটর তাই নিয়ে আগে থেকে মাথা ঘামাবেনা।'

'ঘামাবেনা।'

'তাহলে আমি রাজী।'

* * 'অপারেশন ঘণ্টাকর্ণ যুগ যুগ জীও !'

—প্রজ্ঞা উঠে দাঁড়ালেন।

—শ্লোগানে গলা মেলালো গর্জন, বাজীরাও, খণ্ডগিরি এবং ঘণ্টার বাবা উৎকোচ।

কমপিউটরের কাজ কমপিউটর করেছে।

এখন.

মানুষের কাজ মানুষ করছে।

তুষার কন্যা

ডঃ সুপ্তি সেন

সেদিন ছিল দারুণ শীত।

সারাদিন বয়ে গেছে বরফ ঝড়, এখন পড়ন্ত বেলায় সবে সূর্যটা দেখা দিয়েছে।

দুটি ছোট ছেলেমেয়ে বাইরে গিয়ে খেলবার অনুমতি চাইল তাদের মায়ের কাছে।

তাদের মধ্যে বড় মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী, দেখতেও সুন্দর, নাম ভায়োলেট। সঙ্গে তার ছোট ভাই পিওনী, তার ফোলাফোলা লাল গাল দেখলে লাল ফুলের কথা মনে হয়।

ওদের বাবা মিস্টার লিগুসে হার্ডওয়্যারের ব্যবসাদার, ভারী ভালো মানুষ, কিন্তু একেবারে বাস্তববাদী কাঠখোট্টা স্বভাবের। তবে ওদের মায়ের মনে একটা সূক্ষ্ম ধরনের কবিত্বের ভাব আছে—এত বয়সেও যা হারিয়ে যায় নি।

এই মায়ের কাছেই ভায়োলেট আর পিওনী আবদার ধরল

সত্যিই এখন বরফের ওপরে রোদ্দূর পড়ে ভারী লোভনীয় দেখাচ্ছে। গাছপালাগুলোতে পাতা

নেই, ডালগুলিতে পাতলা বরফের আচ্ছাদন কোন কোন ডালে বরফের জমাট বাঁধা সুগোল ফল ঝুলছে।

মা অনুমতি দিলেন।

ওদের ঠাণ্ডায় বাইরে যাবার মত উলের জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন তিনি। জুতো মোজা, টুপি, হাতেও দস্তানা।

লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়ে এল ভায়োলেট আর পিওনী কী আনন্দেই না ছোটাছুটি শুরু করল তারা

এ ওর গায়ে বরফের কুঁচি ছুড়ে মারছে তারা। পিওনীর মুখে বরফ মাখাতে মাখাতে ভায়োলেটের মাথায় একটা আইডিয়া এল।

—তোমাকে ঠিক বরফের পুতুলের মত দেখাচ্ছে পিওনী। একটা বরফের পুতুল তৈরি করলে হয় না? আমাদের একটা ছোট বোন? আমাদের সঙ্গে খেলবে

—হ্যাঁ। পিওনী সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো

যেইনা ভাবা, তেমনি কাজ। ওরা সঙ্গে সঙ্গে পুতুল গড়তে লেগে গেল।

জানলায় বসে ছিলেন ওদের মা। ছেলেমেয়ের কথা কিছু কিছু শুনেছিলেন। হাসতে হাসতে ভাবলেন বরফ দিয়ে জ্যান্ত মেয়ে তৈরি করতে চাইছে বাচ্চারা।

কত কায়দা করেই না পুতুল গড়ছে তারা। ভায়োলেট সর্দারী করছে ভাইয়ের ওপর।

আড়াল থেকে দেখতে দেখতে মা ভারী অবাক হয়ে গেলেন। একেবারে নিখুঁত একটি ছোট মেয়ের চেহারা তৈরি করেছে ওরা।

এদিকে ভায়োলেট পিওনীকে ডাকছে—পিওনী আরেকটু বরফ নিয়ে আয়। পিওনী ওকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ।

পিওনী দৌড়ে দৌড়ে বরফের জোগান দেয়।

উত্তেজিত গলা শোনা যায় ভাইবোনের। ভায়োলেট বলে—পিওনী, ওই গাছের নীচু ডালটায় যে কুঁচো বরফ ঝুলছে সেটা নিয়ে এসো তো। মেয়েটার চুল বানাতে হবে।

পিওনী নিশ্চয়ই বরফটা এনে দেয়। একটু পরে আবার শোনা যায় ভায়োলেটের গলা—এবার চোখ দুটো করতে হবে। ঝকঝকে বরফ চাই। এখনও তো শেষ হয় নি। কী সুন্দর যে হবে। মা ভারী খুশি হবেন। বাবা কিন্তু বলবেন—শীগগির ভেতরে এস, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

পিওনি চেঁচিয়ে ডাকে—মা, মা দেখবে এস।

হাতের সেলাইটা নামিয়ে রেখে মা জানলা দিয়ে মুখ বাড়ান। তাঁর চোখে সোজাসুজি এসে লাগল পড়ন্ত সূর্যের আলো, চোখ ধাঁধিয়ে গেল কেমন।

মা দেখলেন বাইরে বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি বরফের মেয়ে—ঠিক জীবন্ত মেয়ের মত ভায়োলেট আর পিওনী এখনও কারিকুরী চালিয়ে যাচ্ছে।

এত নিখুঁত বরফের পুতুল মা কখনো দেখেন নি। ভাবলেন—আমার ছেলে মেয়েরা সব কিছুই এত ভালোভাবে করে।

আবার সেলাইয়ে মন দিলেন তিনি। পিওনীর এই জামাটা শেষ করতেই হবে। বাচ্চাদের দাদামশায় আসছেন কাল।

বাইরে ভায়োলেট আর পিওনী গল্প করে।

ভায়োলেট বলে—সারা শীতকাল আমরা তিনজন খেলা করব।

পিওনী বলে—আমি ওর গলা জড়িয়ে আদর করব

আমার পাশে বসে ও গরম দুধ খাবে।

—না পিওনী, গরম দুধ খেলে ওর ক্ষতি হবে। বরফের মেয়েরা কেবল বরফের কুঁচিই খায়। ওকে আমি গরম খাবার খেতেই দেব না।

একটু পরে চেঁচিয়ে ওঠে ভায়োলেট।

—পিওনী দেখ্ দেখ্। ওর গালে কেমন লালচে আভা। আকাশের লাল মেঘ থেকে ঠিকরে এসে পড়েছে হয় তো! আরে রংটা তো রয়েই গেল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে, না?

—কী সুন্দর। পিওনী টেনে টেনে জবাব দেয়। ওর চুলগুলো সোনার মত ঝকঝক করছে।

—হ্যাঁ। ভায়োলেট গম্ভীরস্বরে বলে। আকাশের ওই সোনা মেঘ থেকে ওর চুলের সোনা রং। পুতুলটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন বাকী কেবল ঠোঁট দুটো। ঠোঁটদুটো খুব লাল হওয়া চাই। আয় আমরা ওকে চুমু খাই। তাহলে ঠোঁট লাল হয়ে উঠবে ওর।

মা চুমোর শব্দ শুনতে পেলেন।

তাও তো ঠোঁটদুটো তেমন লাল হল না। ওরা ঠিক করল এবার মেয়েটাকে বলা হবে পিওনীর লাল গালে চুমু খেতে। তাহলেই ওর ঠোঁট লাল হবে।

পিওনী ডাকল—বরফ কন্যা। আমায় চুমু খাও। ভায়োলেট দেখে অবাক।

বরফের মেয়ে পিওনীরর ফোলা গালে চুমু দিয়েছে। পিওনী বলে—উঃ কী ঠাণ্ডা ওর ঠোঁট।

হু হু করে একটা ঠাণ্ডা পশ্চিমা বাতাস বয়ে গেল। ভয়ানক হাড় কাঁপানো বাতাস। মা ভাবলেন বাচ্চাদুটিকে এবার ভেতরে ডেকে নেবেন। ঠিক সেই সময়ে দুজনে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—মা মা দেখ, বরফের মেয়ে আমাদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করছে।

মা ভাবলেন কী অদ্ভুত কল্পনা প্রবল আমার ছেলে মেয়েরা। বিশ্বাস করতে চায় বরফের মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

কিন্তু বাচ্চারা যখন বাইরে থেকে চেঁচামেচি করে ডাকতে লাগল মা আর থাকতে পারলেন না। জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলেন।

কী দেখলেন জানো?

ভায়োলেট আর পিওনীকে তো দেখলেনই; আর দেখলেন আরও একজনকে। ছোট্ট একটি মেয়ে, ধবধবে সাদা জামা পরা গোলাপী গাল আর সোনা রঙের চুল, ছুটে ছুটে ওদের সঙ্গে খেলা করছে। অচেনা মেয়ে, অচেনা মুখ। কিন্তু মনে হয় ভায়োলেট আর পিওনী ওকে যেন কতদিন চেনে।

মা অবাক হলেন না। এ মেয়েটি নিশ্চয় পাশের কোন বাড়ির মেয়ে হবে। বাচ্চাদের খেলতে দেখে

বেরিয়ে এসেছে।

তাই ছোট মেয়েটিকে বাড়ির ভেতরে অভ্যর্থনা করার জন্যেই দরজা খুললেন মা। রোদ এখন পড়ে এসেছে, বাইরেটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা।

কিন্তু দরজা খুলেই আবার ধাঁধা লেগে গেল তাঁর। সত্যিই কী মেয়েটিকে ডাকা উচিৎ? সত্যিই কী ও পাশের বাড়ির মেয়ে? নাকি বরফের ওপর রং বেরঙের আলো পড়ে ওরকম দেখাচ্ছে।

কেন না, মেয়েটির চেহারা সত্যিই বড় অদ্ভুত। কাছাকাছি কোন বাড়িতে ওরকম কোন মেয়ে নেই। ওই রকম ধব্‌ধবে রং, গোলাপী গাল, সোনালী চুল। আর জামাটাও একেবারে ফুর ফুরে সাদা। এই ঠাণ্ডায় কোন মা কি অত পাতলা জামা পরিয়ে পাঠাবে বাচ্চাকে?

মেয়েটার ছোট্ট দুপায়ে হাল্কা চটি।

ঠাণ্ডায় মা যেন নিজেই শিউরে উঠলেন।

কিন্তু মেয়েটার যেন একটুও শীত করছে না।

এত তাড়াতাড়ি দৌড়চ্ছে ও যে ভায়োলেট হাঁপিয়ে যাচ্ছে, আর পিওনী তো পিছিয়েই পড়েছে অনেকক্ষণ।

একবার, মা দেখলেন, খেলতে খেলতে মেয়েটি দুজনের দুহাত ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিল পিওনী, যেন ভীষণ ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া লেগেছে তার। ভায়োলেটও হাত ধরে থাকতে পারল না। মেয়েটা কিছুই বলল না। আবার খেলা চলতে থাকল।

মা ভায়োলেটকে ডেকে ফিস ফিস করে জিগেস করলেন মেয়েটির নাম কী।

শুনে ভায়োলেট হেসেই কুটিপাটি। ওই তো আমাদের বরফের মেয়ে, মা।

—হ্যাঁ মা, পিওনী ছুটে এল—আমাদের বরফের বোন। বেশ ভাল মেয়ে, না মা

শীতের সাদা পাখীরা কোথা থেকে উড়ে এল। ঘিরে ধরল মেয়েটিকে। কেউ কেউ বসল তার কাঁধে, কেউ হাতের পাতায়। যেন মেয়েটি কত কালের চেনা ওদের।

মা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—সত্যি বল তো ভায়োলেট, মেয়েটা কে?

এমন সময় বাইরের গেট খুলে বাড়িতে এলেন বাচ্চাদের বাবা সেই মিস্টার লিণ্ডসে। বরফের ছোঁয়াচে মুখখানা তাঁর লাল। বাড়িতে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

বাইরের বাগানে বাড়ির সকলকে দেখে তিনি তো অবাক। ছোট মেয়েটাও নজরে এল তার।

একগুচ্ছ জমাট বরফের মত নেচে বেড়াচ্ছে মেয়েটা।

—কে এই মেয়েটি? বাস্তববাদী বাবা জিগ্যেস করলেন —ওর মা কী পাগল? এই পাতলা জামা আর চটি পরে বাইরে আসতে দিয়েছে?

মা বল্লেন মেয়েটি কে আমিও জানি না। পাড়ার কোন মেয়েটেয়ে হবে। ছেলে মেয়েরা বলছে ওরা বরফ দিয়ে ওকে তৈরি করেছে।

—হ্যাঁ বাবা, পিওনী বলে ওঠে, ওকে আমরা তৈরি করেছি কী সুন্দর না?

—পাগল

বাবা কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বরফ দিয়ে জ্যান্ত মানুষ তৈরি করা যায় না। ওই মেয়েটিকে ভিতরে নিয়ে এস। রুটি আর গরম দুধ খেতে দাও আরাম করে বসতে দাও। আমি পাশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসি, কাদের মেয়ে হারিয়েছে।

ভালমানুষ মিস্টার লিণ্ডসে এই বলে বরফের

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাবার দুহাত ধরে আটকাল ভায়োলেট আর পিওনী।

—সত্যি বাবা ও বরফের মেয়ে। ওকে গরম ঘরে ঢুকিও না।

—পাগলের মত বক্‌ছিস তোরা। এখুনি ভিতরে যা। বাবা ধমকে ওঠেন। আমি দেখি মেয়েটার কী ব্যবস্থা করা যায়। নাহলে ঠাণ্ডাতে মরেই যাবে ও।

এবার তাঁর স্ত্রীও বারণ করেন তাঁকে —ভেবে দেখ, সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত। এমনও তো হতে পারে, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলবার জন্যে নেমে এসেছে কোন দেবদূত।

—তুমিও দেখছি ভায়োলেট আর পিওনীর মত শিশু হয়ে গেলে!

মিস্টার লিগুসে বাগানে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে দেখেই উড়ে পালিয়ে গেল শীতের পাখিরা। মেয়েটাও ছুটে চলে গেল দূরে—যেন সে বলতে চায়, ছুঁয়ো না আমায়।

দূরে বরফের মধ্যে পালিয়ে যেতে লাগল সে।

ভালমানুষ বাবাও চলেছেন তার পেছন পেছন। তাঁকেও দেখাচ্ছে যেন একটা বরফের বিরাটকায় পুতুল। আশপাশের লোকেরা জানলা খুলে দেখতে লাগল মিস্টার লিগুসে বাচ্চাদের মত বাগানে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

অবশেষে তাকে কোণঠাসা করে ফেললেন তিনি—এস পাগলী মেয়ে। এবার ধরেছি তোমায়। 'গরম মোজা পরিয়ে শাল মুড়ি দিয়ে দেব আমরা। তোমার নাকের ডগাটি বরফের মত সাদা হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।

হাত ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন তাকে।

মেয়েটার চক্‌চকে ভাব একদম উবে গেছে। মাথা নীচু করে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আসছে সে।

ভায়োলেট আর পিওনী করুণ স্বরে বাপকে অনুরোধ করলে ওকে বাড়িতে নিয়ে না যেতে!

—পাগল? বাবা বল্লেন—ওর হাত এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে দস্তানার ওপর দিয়েও আমার হাতে ঠাণ্ডা লাগছে। শীতে ও যে মরে যাবে।

ভায়োলেটের মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে। মনে হল যেন ভায়োলেটের ছোট ছোট আঙুলের অস্পষ্ট ছাপ মেয়েটার গলায়। এইমাত্র ভায়োলেট তৈরি করেছে পুতুলটাকে। স্বামীকে সাবধান করতে গেলেন তিনি। —মেয়েটা বোধহয় সত্যিই বরফের তৈরী।

একদম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটে গেল মেয়েটার গায়ে, অম্‌নি ঝলমলিয়ে উঠল সে।

বাবা ততক্ষণে অনিচ্ছুক অতিথিকে টানতে টানতে ঢুকিয়েছেন ভেতরে—বরফ, বরফের মত ওকে দেখাচ্ছে বই কী! প্রায় জমেই গেছে ও। তবে আগুনের আঁচে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

আর কথা না বাড়িয়ে এই দয়ালু স্বভাবের মিস্টার লিগুসে মূর্ছিত প্রায় মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন আগুনের সামনে।

বারান্দায় লাল টুকটুকে পর্দা ঝুলছিল ভেতরে গরম স্টোভে ফুটছিল গরম জল। এখানে বাইরের ঠাণ্ডার চিহ্নটুকুও নেই।

মিস্টার লিগুসে তাকে এনে বসিয়ে দিলে স্টোভের সামনে।—আরাম কর, বাচ্চা

মেয়েটাকে ভারী বিষণ্ণ দেখাল। যেন তাকে কী রোগে ধরেছে একবার করুণ চোখে বরফে ঢাকা বাইরেটার দিকে চাইল মেয়েটি।

হু হু বাতাস তাকে বন্ধুর মত ডাকছে। এদিকে

গরম স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে গলে যাচ্ছে সে।

বাবা মাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন—উলের মোজা আর শাল নিয়ে এস ওর জন্যে। ডোরাকে বল গরম দুধ নিয়ে আসতে। ভায়োলেট আর পিওনী তোমাদের বন্ধুর সঙ্গে খেলা কর। আমি ওর বাবা মায়ের খোঁজটা নিয়ে আসি।

অতএব মা গরম জামাকাপড় খুঁজতে গেলেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে মিস্টার লিণ্ডসে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সবে বাইরের গেটটা খুলেছেন, এমন সময়ে ভেসে এল বাচ্চাদের চিৎকার।

মা চেঁচিয়ে ডাকলেন। আর মেয়েটার বাপ মাকে খুঁজতে যাবার দরকার নেই।

ভায়োলেট আর পিওনী কাঁদে। আমরা তোমায় বারণ করেছিলাম, বাবা। বরফের মেয়ে গলে গেছে। কান্নায় ভেসে যাচ্ছে ওদের মুখ।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন মিস্টার লিণ্ডসে। একী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা।

ঘরের কার্পেটের ওপর পড়ে রয়েছে স্তূপীকৃত বরফের গুঁড়ো।

স্টোভের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জলের স্রোত।

মেয়েটার এই বাকী রয়েছে। মা বলেন দুষ্টু বাবা। পিওনী কেঁদে ওঠে।

সে যাই হোক, মিস্টার লিণ্ডসের মত প্র্যাকটিকাল লোককে কিছু শেখানো যায় না।

যদি তাঁদের জানা শোনার বাইরে অদ্ভুত কিছু ঘটেও যায়, তাঁরা সেটা মানতে চান না।

খানিকক্ষণ নীরবতার পরে মিস্টার লিণ্ডসেই প্রথম কথা বলেন—দেখেছ, বাচ্চারা কী পরিমাণ বরফ এনে ঘরে ঢুকিয়েছে জুতোয় করে। এখানে যে বন্যা হয়ে গেল ডোরাকে বল ঘরটা মুছে দিয়ে যাবে।

• • [illegible] হথর্ন—দি স্নো ইমেজ

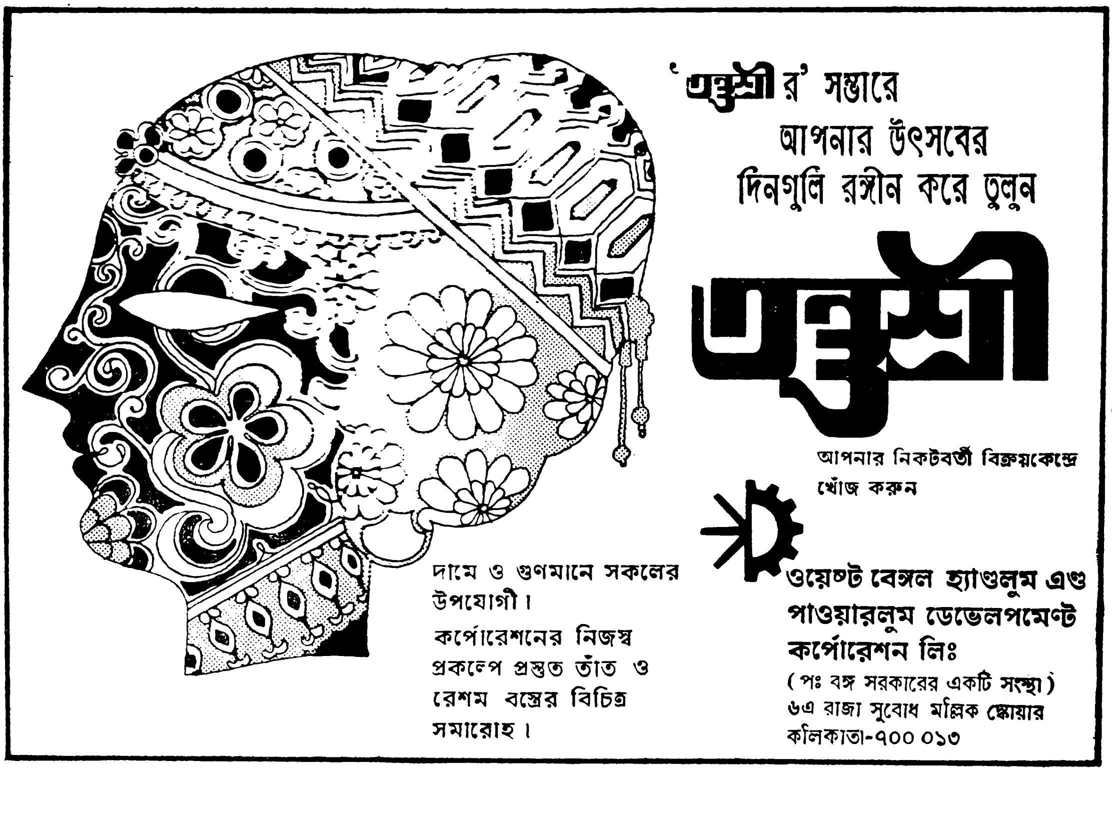

গাছে গাছে....
খুব দ্রুত এগোচ্ছে!
হুম, রান্নার গন্ধ।
টারজান ওদের হদিশ পেল...
বন্দী জেন। তাকে ঘিরে কয়েকজন লোক...
টারজান ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নেয়...

একটি ভয়ংকরের জন্ম

উৎপল ধর

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম নাহয় নাই বললাম। সেদিন সোমবার, হাটবার। একটু আগে সূর্য বিদায় নিয়েছে 'আবার দেখা হবে' প্রতিশ্রুতি দিয়ে। একটু একটু করে সন্ধ্যা বাড়ছে। হাটের লোকজন কমে আসছে। দোকানীরা জিনিস পত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। এরই মাঝে শিয়াল 'হুক্কা হুয়া' বলে জানিয়ে দিল তাদের ডিউটির সময় হয়েছে।

ছোট মিশনারি হস্‌পিটাল। এইমাত্র জন্ম হয়েছে একটি শিশুর। ডাক্তার শিশুটিকে তুলে দিলেন নার্সের হাতে। টাওয়েলে করে শিশুটিকে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে অভিজ্ঞ নার্স বোধহয় একটু চমকে উঠলেন। এইমাত্র যার জন্ম হ'ল তার মাথায় বড় বড় চুল! চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গরম জল আনতে। গরম জল এনে শিশুটিকে তুলতে গিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। বাচ্ছাটি তার দিকে তাকিয়ে হাঁসছে। ঐতো, ওর মুখের বত্রিশ পাঁটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। চিৎকার করে তিনি দৌড়ে গেলেন ডাক্তারের দিকে। বার বার জিজ্ঞাসা করেও কি হয়েছে জানতে না পেরে ডাক্তার তাকালেন শিশুটির দিকে। কিন্তু কিন্তু এ কি! তিনি তাড়তাড়ি নার্সকে ধরে ঘরের বাইরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন।

চার দিকে অন্ধকার। বারান্দার এক কোণে লণ্ঠন জ্বলছে। জোনাকি পোকাগুলো কৃপণের মত একটু একটু আলো দিয়ে অন্ধকার যেন আরো বাড়িয়ে তুলছে, আর সেই সঙ্গে নিজেদের নির্ভীকতার পরিচয় দিচ্ছে। ডাক্তার হয়তো মনে মনে ভাবছে, ওদের মত যদি নির্ভীক হওয়া যেত। ঘরে এইমাত্র যা দেখে এসেছেন, এখন আর একলা ঘরে ঢোকার সাহস হচ্ছে না। লোকজন ডেকে আনতেও অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণে যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। না, একলাই যেতে হবে। তিনি নিজ চোখে দেখে এসেছেন, নবজাতক শিশুটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় চোখের ভুল—একটু সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করেন। নার্সকে বারান্দায় রেখে এগিয়ে যান সেই ঘরের দিকে।

কিন্তু কৈ। শিশুটিতো দাঁড়িয়ে নেই। যেমন শুইয়ে রাখা হয়েছিল, তেমনি শুয়ে আছে। এবার সাহস পেয়ে তিনি এগিয়ে যান শিশুটির দিকে। কিন্তু দু'পা ফেলেই চমকে উঠেন—শিশুটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

এবার আর ভয় নয়। ডাক্তার মনস্থির করে ফেলেন এবার কি করতে হবে। তিনি ধীরে ধীরে দেওয়াল ঘেঁসে এগিয়ে যান শিশুটি যেদিকে মুখ করে আছে তার উলটো দিকে যেখানে টেবিলের উপর রাখা আছে অপারেশনের সরঞ্জাম। দ্রুতহাতে তুলে নিলেন একটি ছুরি। তারপর ঘুরে শিশুটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। শিশুটি তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর তার মুখে হাসি নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে ভয়ংকরতা। আর দেরি নয়। এবার হাতের মুঠোয় ছুরি শক্ত করে ধরে এগিয়ে চললেন। তিনি যত এগোচ্ছেন, শিশুটিও তত বড় হচ্ছে। এখন আর শিশু নয় যেন একটি ক্ষুদে রাক্ষস। হাতের লম্বা লম্বা নোখ, বড় বড় দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এতদূর এসে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের
আগামী সংখ্যায় পাবে

তোমাদের জন্য ঐতিহাসিক রহস্য সংখ্যা

বিশেষ আকর্ষণের একটি

প্রিজনার অভ জেন্দা

এর সচিত্র কাহিনী. এছাড়া থাকবে 'গল্প লেখা' প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীদের লেখা গল্প

সেরা আরও একটি সচিত্র কাহিনী

গুপ্তধন রহস্য

এবং ধারাবাহিক সব লেখাই পাবে।

এ ছাড়া আকর্ষণীয় বিভাগ ও অন্যান্য রচনা

টারজনকে নিয়ে (কমিকস) এবং বিষাক্ত ওষুধ রহস্য

মনেরেখোর বিজ্ঞানের প্রশ্ন মালা

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ছবিতে) ঠিক সময় তোমাদের হাতে
মাসের প্রথম সপ্তাহেই তুলে দেব।
দাম দু'টাকাই থাকবে।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ : ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড : কলিকাতা-৭০০০০১ : ফোন ২২-২৭৭০

যুক্তি নেই, বিশেষ করে যেখানে বিপদের সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ। মনকে আরো একটু শক্ত করে আর দু'পা এগিয়ে সেই ভয়ংকর শিশুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। শুধুমাত্র এক মুহূর্ত। প্রায় দু-ফুট লম্বা ভয়ংকর শিশু আক্রমণের ভঙ্গিতে লাফ দিল ডাক্তারের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটি করুণ আর্তনাদ। ডাক্তার এবং শিশু দুজনেই লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। কপালে ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া। ডাক্তার ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। দেখতে পেলেন নার্স বাতাস করছে, পাশেই বসে আছে কম্পাউণ্ডার, সঙ্গে একজন লোক। চেনা চেনা লাগছে। আস্তে আস্তে সবকিছু মনে করার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই ভদ্রলোক বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তার প্রথম শিশুর জন্মের শুভ সংবাদ শোনার জন্য। রাত কটা বাজে বোঝা যাচ্ছে না। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন বুঝতে পারলেন না। কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন। "আমি দুঃখিত কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।"

শেষাংশ শিশুর বাবার মুখেই শোনা যাক্। "আমি এবং কম্পাউণ্ডার বাবু বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখলাম নার্স অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে আসছে। সামনে আসতে মুখ দেখে বুঝলাম দারুণ ভয় পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওর মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না করে দৌড়ে এসে দরজার সামনে থমকে দাঁড়াই। দেখতে পেলাম ঘরের ভিতর টেবিলের ওপর দাড়িয়ে আছে এক ভয়ংকর মানব আকৃতির প্রায় দু-ফুট লম্বা জীব। মাত্র এক মুহূর্ত। দেখলাম সেই ভয়ংকর জীব আক্রমণের ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। একটি করুণ আর্তনাদ। দুজনেই লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। সামনে এসে দেখি ডাক্তার বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। পাশেই পড়ে আছে একটি শিশু বুকে বিঁধে আছে একটি ছুরি···লাল···রক্ত···।" বলতে বলতে গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখের কোণে ভেসে উঠলো দু-তিন কোটা জল।

কি
ভাবছেন?
ছেলেমেয়ের লেখাপড়া?
কন্যার বিবাহ?
অথবা
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা?
আজই
ফেবারিট
সঞ্চয় প্রকল্পে
যোগ দিন
সেবা
ও
সঞ্চয়ের
একমাত্র
প্রতীক

FAVOURITE ★ SMALL INVESTMENT LIMITED

ফেবারিট
স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
হেড অফিস:
৮এ, পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০১৬.
ফোন ২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১
২১-৩৫৮৮
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব
শ্রী এন, দে

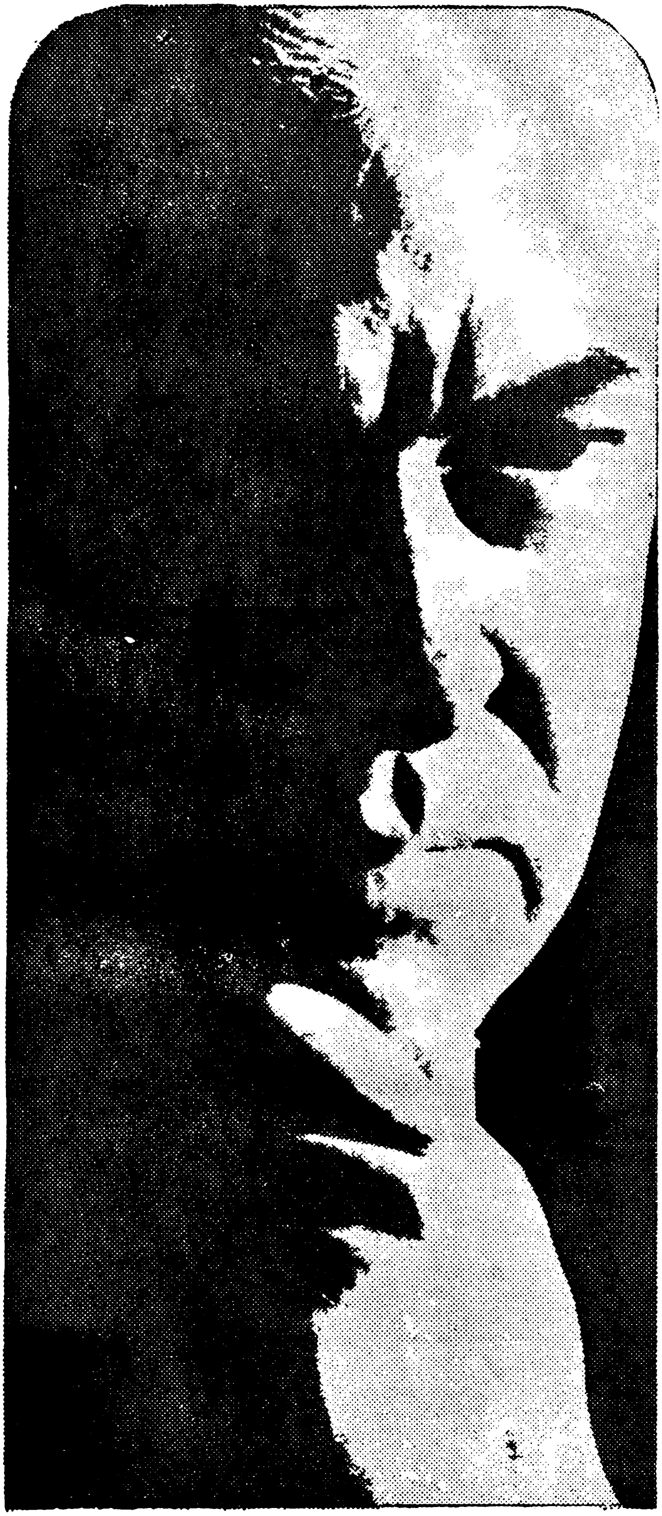

আমার জন্মদিনে
ভাইয়ের দেওয়া উপহার…

ইউকোব্যাঙ্কে তার জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই।

সত্যিই কি সুন্দর ট্রান্‌জিস্টার কিনেছে আমার জন্য। ইউকোব্যাঙ্কে জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই সে এটা কিনেছে।

এই ব্যাঙ্কে টাকা বেড়েই চলে। কারণ এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে ওঁরা তোমাকে আরো বেশি টাকা দেবেন। ওঁরা একে বলেন সুদ।

তোমার হাতখরচের টাকা বাড়িয়ে নেবার কি চমৎকার রাস্তা, তাই না?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-109/82 BEN

Chief Editor : Amitava Sen, Phone : 22-2770
Printed, Published & Edited by Mahindra] Basu from 26, Strand Road, Calcutta-700 001 and Printed by him from Tara Printing Works 100, Arabinda Sarani, Calcutta-700 006.
A. H.W.